আনন্দ

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

প্রকাশক—শ্রীশরৎকুমার শীল
শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী.
১১২ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার শীল
শীল-প্রেস,
১১০ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

নটকবি অমরেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থাবলী।

১। অভিনেত্রীর রূপ (সচিত্র উপন্যাস) ১।০
২। আদর (ঐ ঐ) ১৲
৩। হরিরাজ (ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক) ১৲
৪। ফটিক জল (") ৸০
৫। শ্রীকৃষ্ণ (নাট্যগীতা) ।৵০
৬। কিস্‌মিস্‌ (রঙ্গ-নাট্য) ।৵০
৭। প্রেমের জেপলিন (") ।৶০
৮। কেয়া মজেদার (") ।০
৯। রগা-পাগলা যন্ত্রস্থ
১০। দলিতা-ফণিনী
১১। বড় ভালবাসি
১২। জীবনে মরণে
১৩। বজ্রা
১৪। থিয়েটার

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী,
১১২ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

আদর

১

দুর্গাচরণ মিত্র পীড়িত; বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছা-কাছি হইয়াছে। আজ কিছু বাড়াবাড়ি। ইংরাজ ডাক্তার এইমাত্র বলিয়া গিয়াছে,—'আর আশা নাই—আজ রাত্রেই যা হয় একটা হইবে'।

পরিবারস্থ সকলেই বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িয়াছে; হতাশ প্রাণে রোগীর মুখ চাহিয়া আছে; কলিকাতার মধ্যস্থ পল্লীতে দুর্গাচরণের বাস। দুর্গাচরণ, "স্বনামো পুরুষো ধন্যঃ"। পৈতৃক সম্পত্তি তেমন কিছুই পান নাই। তিনি কোনও এক সওদাগরী আফিসে চাকরি করিতেন। আয় যথেষ্টই ছিল। সংসারে মিত্রজা স্বয়ং, পুত্র শ্যামাচরণ, গৃহিণী রাজেশ্বরী, পুত্রবধূ

আদরিণী ও একটী মাত্র দাসী; সুতরাং খরচ খু
কমই ছিল। দুর্গাচরণ খরচপত্র সম্বন্ধে ভারি কড়
কড়ি করিতেন। গৃহিণী রাজেশ্বরী মধ্যে মধ্যে বলি
তেন, 'আর দুইজন দাসী ও একজন চাকর
হইলে চলে না'।

নিরঞ্জনের এইরূপ উত্তর ছিল, 'আমি ও সব
বাজে আড়ম্বর করিতে নারাজ। হিন্দুর ঘরের মেয়েদে
ঘর নিকান হইতে বাসন মাজা পর্য্যন্ত সকল কাজ
করা উচিত'। অনেকে হয়ত নিরঞ্জন মহাশয়কে কৃপ
বলিবেন, কিন্তু আমি বলি, যাহারা দুঃখের অবস
ভোগ করিয়া অনেক দিনের পর স্বচ্ছন্দের মু
দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন, দুর্গাচরণের কর্ত্তব্যজ্ঞা
ছিল কি না।

মোট কথা, দুর্গাচরণ স্বোপার্জ্জিত ধনে বাগানবাড়
এবং কোম্পানীর কাগজও রীতিমত করিয়াছিলেন।

অন্তিম শয্যায় দুর্গাচরণ শায়িত। পরিবারব
কাছে বসিয়া পর মুহূর্ত্তে যেন কি একটা দা
আঘাত লাগিবে, তাহার জন্য বুক পাতিয়া প্রতী

করিতেছে। সকলেই ভাবিতেছে, 'সে আঘাতের পরিণাম কি,?'

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। আকাশ মেঘে ভরিয়া গিয়াছে। রোগীর জীবনাশার মত, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকিতেছিল। যেন শ্যামাচরণ, রাজেশ্বরী ও আদরিণীর হৃদয়ের প্রতিরূপ দেখাইবার জন্যই প্রকৃতি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে সাজিতেছে।

রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ দাঁড়াইতে লাগিল। রাজেশ্বরী ও আদরিণী ব্যাকুল হইল; বুঝি আর প্রাণের বেগ ধরিয়া রাখিতে পারে না।

শ্যামাচরণ শিক্ষিত যুবক। যাবাবধি হইল, ওকালতী পরীক্ষায় পাশ হইয়া আপিস খুলিয়াছেন। জগত ব্যাপারে যদিও তাঁহার কার্য্যগত শিক্ষা (Practical knowledge) ছিল না কিন্তু কল্পনাগত শিক্ষা (Theoritical Knowledge) তাঁহার যথেষ্টই ছিল। তিনি বিপদে গাম্ভীর্য্য আনিতেছেন। অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন,—"ডাক্তারকে খবর দেওয়া প্রয়োজন।"

দুর্গাচরণ পাশ ফিরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। সে নিশ্বাসের সহিত কত অতীত, কত বর্ত্তমান, কত ভবিষ্যৎ জড়িত ছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

রাজেশ্বরী কতক বুঝিয়াছিলেন, আচলে চোখ মুছিলেন। দুর্গাচরণ বলিলেন, 'আর কেন কতকগুলা অনর্থক খরচ করিবে; ডাক্তারকে খবর দিয়া কোন ফল ফলিবে না। জীবনের প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছি যতই চেষ্টা কর না কেন, কোনও মতে ফিরাইতে পারিবে না, ভবিষ্যৎ-জীবনের দ্বারে পৌঁছিয়া, সত্যের উজ্জ্বল আলোকিত পথ পাইয়া, আর কি অনিত্য ফাঁসে জড়াইতে সাধ যায়? যা বলিতেছি শোন। দেখ, শ্যামাচরণ! আমি ত চলিলাম; যেরূপ বলিতেছি, সেইমত কার্য্য করিও। পরিণাম সুখকর হইবে। দেখ, বর্ত্তমান জগৎ পর পর নাই কুৎসিত আবরণে গঠিত। প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, প্রলোভন, স্বার্থপরতা, শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে। সুন্দর যা কিছু, কাল-মাহাত্ম্যে সকলই ডুবিয়া গিয়াছে। খুব সতর্কতার

সহিত পা ফেলিও, নচেৎ বিপদ জানিবে। তুমি শিক্ষিত: তা বলিয়া মনে করিও না যে পৃথিবীর বক্র পথ বই পড়া, বিদ্যার দ্বারা সরল করিয়া লইতে পারিবে। কার্য্যগত শিক্ষা ব্যতীত, মানুষের ভবিষ্যৎ নিরাপদ হইতে পারে না। মনে কর, আমার হাতের একস্থান কাটিয়া গিয়াছে। সেই ক্ষতস্থানে নুণ পড়িলে কতটা জ্বালা হয়, সম-অবস্থাপন্ন ব্যক্তি যতটা বুঝিবে, তুমি বিজ্ঞান পড়িয়া সে জ্বালার পরিমাণ অনুভব করিতে পারিবে কি? সে যাহা হউক, কাহাকেও বড় একটা বিশ্বাস করিও না; সংসর্গ বর্জ্জন যত করিতে পার, ততই ভাল; কারণ বেশ জানিও, যার যতটা ঘনিষ্ঠতা প্রবল, তাহার স্বার্থের ভিত্তি ততটা সুদৃঢ়। ওসব প্রকৃতির লোকের নিকট হইতে যতই তফাৎ থাকা যায় ততই মঙ্গল। আর এক কথা, তুমি উকীল হইয়াছ,—উকীলের ধর্ম্ম কি জান? শঠতা মিথ্যা কথা কহা, পরের সর্ব্বনাশ করা, পরকে অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া প্রভৃতি এমন কিছু ভয়ানক কাজ নাই, যাহা উকীলের দ্বারা সম্পন্ন না হয়। তুমি যখন

ওকালতী পরীক্ষা দাও, নিষেধ করিয়াছিলাম; আমার কথায় মনোযোগ দাও নাই। যাহা হউক প্রাণান্তেও অধর্মের প্রশ্রয় দিও না। সৎপথে থাকিয়া উন্নতি করিতে পার ভালই। উকীলের দল তোমার সহিত মিশিবার চেষ্টা করিবে। যদি উহাদের মিষ্ট কথায় ভুলিয়া, উহাদের সহিত বন্ধুত্ব কর, অল্পদিনের মধ্যেই নেশাখোর হইয়া, চরিত্রের মাথা খাইয়া, যা কিছু সঞ্চিত আছে—সব উড়াইয়া, হয়—পথের ভিখারী হইতে হইবে, না হয় আত্মহত্যা করিতে হইবে। আপনার কাজ লইবার নিমিত্ত যতটুকু সম্বন্ধ রাখা উচিত, ততটুকু সম্বন্ধ রাখিও। বেশী আত্মীয়তা করিতে গিয়া আপনার স্বার্থ খোয়াইও না।

শ্যামাচরণ একমনে কথাগুলি শুনিলেন। কোনও উত্তর করিলেন না। জীবনের বিস্তৃত অশ্রান্ত পথে, তাঁহার মন যেন ছুটিয়া চলিল।

আকাশে মেঘ হুঙ্কার করিয়া উঠিল; জোর বাতাস বহিতে লাগিল; বৃষ্টি আরম্ভ হইল। রাজেশ্বরীর বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। বোধ হইল

বুঝি জগদীশ্বর প্রতিকূল হইয়া, প্রকৃতি লইয়া তাহার বিরুদ্ধে, একটা ভারি গুরুতর আয়োজন করিতেছেন। আ.রিণী, মুগ্ধা তটিনীর মত নিস্তব্ধ হইয়া লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল।

দুর্গাচরণ। কথা কহিতে ক্রমে জড়তা আসিতেছে। প্রবাসের খেলা ফুরাইল। আবাসে যাইতেছি। একটী মাত্র অনুরোধ। মৃত্যুকালের একটী মাত্র অনুরোধ রাখিবে কি?

শ্যামাচরণ। অনুমতি করুন। আপনার কথা কখনও অমান্য করি নাই,—করিবও না।

দুর্গাচরণ।—দেখ, চিরকাল তোমায় দাবিয়া রাখিয়া আসিয়াছি; বাবুয়ানার পথ দিয়া যাইতে দিই নাই। নিতান্ত গৃহস্থের ছেলে যেরূপ চালে থাকে, তোমাকে সেই চালে রাখিয়া আসিয়াছি। এখন তুমি প্রকৃত সম্পত্তির অধিকারী হইতে চলিলে। টাকা হাতে পাইয়া গরম হইয়া, চাল বাড়াইও না। তাহা হইলে কলসীর জল গড়াইয়া ক্রমে ফুরাইয়া আসিবে। আমাকে ছুঁইয়া শপথ কর, মাতৃ-ভক্তি চিরদিন অটুট

রাখিবে। আমার বড় আদরের আদরকে এক বিন্দু অযত্ন করিবে না। আহা! আমার আদরের হাসি মুখখানি কখন যেন মলিন না হয়।

শ্যামাচরণ আর একটী কথাও কহিলেন না। চোক দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

শ্যামাচরণ! তুমি শিক্ষিত। বিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তি ও তর্কশাস্ত্রে তোমার পুরা অধিকার। এ পৃথিবী নশ্বর। বাপ, মা, ভাই, বন্ধু সকলেই দুদিনের জন্য। এ সকল জানিয়াও তোমার চখে জল কেন? হায় রে মায়া! তোমার প্রলোভনে পড়িয়া দর্শন, বিজ্ঞান, যুক্তি সবই ভাসিয়া যায়। সংসারী যে উন্নতি করিতে পারে না, সে কেবল তোমারই জন্য।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় ডাক্তার আসিয়া, যথাবিহিত দেখিয়া শ্যামচরণকে ইংরাজীতে বলিয়া গেলেন,—প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক, আর বড় বিলম্ব নাই।

ক্রমে সময় হইয়া আসিল। এক একটী করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। দুর্গাচরণের ইহখেলা এ জনমের মত ফুরাইল।

রাজেশ্বরী আছাড় খাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আদরিণী দুর্গাচরণের পায়ের উপর পড়িয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

শ্যামাচরণ পূর্ব্বে কখন কোন আঘাত পান নাই; তাহার মনে হইল,—'পৃথিবীটা কি রকম?'

২

যথাসময়ে খুব সমারোহে দুর্গাচরণের শ্রাদ্ধশান্তি হইয়া গেল। মাস দুই যাইতে না যাইতে শ্যামাচরণের চাল ফিরিতে লাগিল। তাঁহার অনেকগুলি উকীল 'ফ্রেণ্ড' জুটিয়াছিল। তাঁহাদের মামলা মাথায় দেওয়াই সার হইত। ক্লায়েণ্টের মুখ কখনই দেখিতে পাইতেন না। এমন কি ট্রাম ভাড়াও জুটিয়া উঠিত না—তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া শ্যামাচরণকে পাইয়া বসিয়াছিলেন। পরস্পর বলিতেন, "একবার একটু নেশা এবং মেয়ে মানুষের ঝোঁক ধরাইয়া দিতে পারিলে, এইখানেই কোর্ট করা যাইবে; আর ক্লায়েণ্টের প্রত্যাশা রাখিতে হইবে না। ছয় মাসের রোজগার একদিনে হইবে।"

শ্যামাচরণ বিপদে পড়িয়াছেন। বন্ধুবর্গ প্রায়ই অনুরোধ করেন সাহেবী ফ্যাসানের বাড়ী না সাজাইলে, জুড়িগাড়ী না করিলে, বিশেষ একটু ভড়ং না দেখাইলে,

৮

বাজার পশার হইবে কেমন করিয়া? শ্যামাচরণ যখনই কোন কাজ করিতে যান, তখনই মনে হয়, পিতার মৃত্যুকালে শপথ করিয়াছিলেন, 'কখন চাল বাড়াইব না।'

অনেক তর্ক-যুক্তির পর স্থির হইল, 'আমি ত আপনার ভোগের জন্য কিছুই করিতেছি না, আপনার উন্নতির জন্য যতটুকু দরকার, সেটুকু না করিলে আত্মবঞ্চনা করা হয়। তার পর অল্পদিনের মধ্যেই আপনার পছন্দমত বাড়ীর 'ফ্যাসান' করিয়া ম্যাকীণ্টস্ বারন্দের ফুরাইয়া দেওয়া হইল; এবং আপাততঃ বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকা হইবে, এইরূপ স্থির হইল। বলা বাহুল্য, গাড়ী জুড়ীও কেনা হইল।

রাজেশ্বরী একদিন শ্যামাচরণকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাবা, সকল কাজগুলি বুঝিয়া করিতেছ কি?" শ্যামাচরণ উত্তর করিলেন, "কোন কাজ অবুঝের মত করি নাই, করিবও না। আমি উকীল হইয়াছি, বাহিরে ভড়ং না দেখাইলে পশার জমাইব কি করিয়া? তুমি কি আমার উন্নতির পথ আগুন জ্বালিয়া রোধ করিতে বল?"

রাজেশ্বরী আর কোনও কথা কহিলেন না।

একদিন আদরিণী বলিল, "ওগো উকীল বাবু! পশার জমাইবার জন্য সব ভড়ং ত করিয়াছ, এইবার বাজারে একটা মেয়েমানুষ রাখ, তাহা হইলে কাজের চূড়ান্ত হইয়া যাইবে।"

শ্যামাচরণ হাসিয়া উঠিলেন—ও কথার কোন উত্তর দিলেন না।

ভাল দিন দেখিয়া ভাড়া বাড়ীতে উঠিয়া যাওয়া হইল। পশার যত জমুক না জমুক, বন্ধুবান্ধব যথেষ্ট জমিতে লাগিল।

একদিন সকলে মিলিত হইলে, শ্যামাচরণ বলিলেন, "এ ভাড়া বাড়ী, বন্ধুবান্ধবদের বসাইব কোথায়?"

সকলে বলিল, "এখানে কাজ কি? আপনার বাগানে ব্যবস্থা করুন।" শ্যামাচরণ দুই একবার কথা কাটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষটা কোন মতেই খাতির এড়াইতে পারিলেন না। নেহাৎ দায়ে পড়িয়া রাজী হইতে হইল।

আদর

স্থির হইল, পরদিন সন্ধ্যার পর বাগানে ভোজ ও বাইনাচ হইবে।

কথাটা ক্রমে রাজেশ্বরীর কাণে উঠিল। তিনি আদরকে বলিলেন। শুনিয়াই আদরের প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। তাহার সরল জীবন-স্রোতে কে যেন আগুন জ্বালিয়া দিল—দূর ভবিষ্যৎ-ছায়া যেন আঁধার হইয়া, চোখের উপর ভাসিতে লাগিল। আদরের বুকের ভিতর কাঁদিয়া উঠিল। যথাসময়ে আহারাদি করিয়া শ্যামাচরণ আপনার ঘরে গেলেন। আদর মুখখানি শুকনো করিয়া আসিয়া বলিল—"হ্যাগা কাল নাকি বাগানে ভারী ধুম?" শ্যামাচরণ বলিলেন "ধুম আর কি, বন্ধুবান্ধবেরা একদিন আমোদ করিবার জন্য ধরিয়াছে—তাই বাগানে খাওয়া দাওয়া করা যাইবে।" আদর বলিল, "বাইনাচ কি তোমার বন্ধুদের আমোদের জন্য?" শ্যামাচরণ উত্তর করিলেন, "হাঁ। কেন আদর! তোমার মুখ আজ অমন কেন? যেন কি একটা ভারী ভাবনায় ব্যথিত রহিয়াছ?"

আদর। "দেখ, বলিতেছি বাগানে বাইনাচ হইবে

শুনিয়া আমার প্রাণে যেন কি বিঁধিতেছে। বুকে যেন কি জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে।" কাতরতায় গলিয়া আদর বলিল "তুমি যেও না।" শ্যামাচরণ হাসিলেন এবং বলিলেন, "আদর! যথার্থই তুমি বালিকা, এতদিন আমার সহিত ঘর করিতেছ, আমাকে চিনিলে না। এমন বুকভরা আদর যার ঘরে, সে কি আদরের প্রত্যাশায় আর কোথাও যায়?

আদর। দেখ, মার কাছে শুনিয়াছি, লোক সংসর্গে খারাপ হয়। কাল তুমি তোমার বন্ধুদের কথায় বাগানে মেয়েমানুষ আনাইয়া গান শুনিয়া আমোদ করিবে। হয় ত, আর একদিন তাহাদের অনুরোধে, মেয়েমানুষের বাড়ী যাইতে পার। দেখ মনটা বড় ব্যাকুল হইতেছে। জ্বালা ধরিয়া রাখিতে না পারিয়াই বলিতেছি, তুমি যেও না। ও সকল সংসর্গ ছাড়িয়া দাও।

শ্যামাচরণ এ কথা সে কথা অনেক কথা কহিয়া আদরকে বুঝাইতে লাগিলেন। আদর বোঝে না। তার প্রাণের বেসুরা তার কিছুতেই সুরে বাজিতে চায় না। সে ক্ষীণ করুণ স্বর শ্যামাচরণ যদি কাণ

পাতিয়া শুনিতেন, তবে বুঝিতেন—বালিকার মর্ম্মকাতরতা কতদূর মর্ম্মস্পর্শী।

আদর চায়, সে যদি এখন হইতে তার বুকের জিনিসকে বুকে চাপিয়া না রাখে, আর যদি এক মুহূর্ত্ত বুক হইতে ফেলিয়া রাখে, তবে বুঝি কে তার বুক ছিঁড়িয়া, চিরজীবনের মত ছিনিয়া লইবে।

৩

পরদিন যথাসময়ে শ্যামাচরণের বাগানবাড়ীতে ধুমধামে ভোজ হইয়া গেল। অনেকগুলি বন্ধুবান্ধবের পদার্পণে, বাগান পবিত্র হইয়াছিল।

উকীলের দল একত্র হইয়াছিলেন, বলা বাহুল্য সুরার স্রোত চলিয়াছিল।

অনেকে শ্যামাচরণকে, নিদেন "এক সিপ" লইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্যামাচরণ পানদোষ অত্যন্ত খারাপ বলিয়া তাঁহাদের কথা ঠেলিয়াছিলেন।

তা যেন হইল, কিন্তু তাঁহার আর এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

হীরাবাই যখন গাইল, "জোতে রে যৌবন মধু মাতি গুঞ্জারিযারে," হাসিতে হাসিতে শ্যামাচরণের মুখে যখন পানের খিলি তুলিয়া দিল, অবশ অঙ্গে তাঁহার বুকের উপর যখন লুটাইয়া পড়িল, কে যেন তাঁহার

সুপ্ত শান্তিতে আঘাত করিল; ভবিষ্যৎ বিভীষিকা লইয়া দেখা দিল, শ্যামাচরণ আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন।

শেষে হীরাবাই যখন বাড়ী যায়, শ্যামাচরণের হাত ধরিয়া আধ হিন্দি আধ বাঙ্গালা ভাষায় বলিয়া গেল, "আমার মাথা খান, একবার আমাদের বাড়ী যাবেন, বিশেষ কথা আছে।" শ্যামাচরণ অকূলে পড়িলেন।

প্রাণের কি রূপান্তর! যাহাকে কখনও দেখি নাই, যাহার কথা কখনও শুনি নাই, কোথা হইতে সে আসিয়া জীবনের সর্ব্বস্ব হইতে চলিল। ধর্ম্মাধর্ম্ম, আত্মপর, সংসার, শিক্ষা সব ভাসাইয়া, প্রাণের দুসার, প্রেম, পিপাসা, আশা ভালবাসা, উপহার লইয়া, প্রাণ তার পায় লুটাইয়া পড়িল। নবপরিচিতা চিরপরিচিতা হইয়া হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইল।

ভগবান্! রূপ-মোহে কি আগুন জ্বালিয়া রাখিয়াছ; মানুষ সহজেই আত্মহারা হয়।

রাজেশ্বরী নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারেন নাই, ঘরের মেজেয় আঁচল বিছাইয়া শুইয়াছিলেন, আদর শাশুড়ীর পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল।

আদর

রাত তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। রাজেশ্বরী সেই অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আদর তখনও জাগিয়া। কে জানে কেন আদর কাতর হইয়া পড়িতেছে। তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে কিসের এক তরঙ্গ ছুটিয়া, তাহাকে আকুল করিয়া ফেলিতেছে, কে যেন তাহাকে আত্মহারা করিয়া, তাহার প্রাণের সুখ শান্তি ছিনাইয়া লইতেছে, বুক বাঁধিবার বল না পাইয়া বড় জ্বালায় বালিকা নীরবে কাঁদিতেছিল।

নিতান্ত অপরাধীর মত শ্যামাচরণ বাড়ী আসিলেন।

আদর রাজেশ্বরীকে জাগাইয়া দিল। রাজেশ্বরী উঠিয়া 'এস বাবা'! এই 'আস' 'আস' করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারি নাই, ঘরের মেজেয় একটু গড়াইতেছিলাম। রাত অনেক হইয়াছে, যা বলিবার আছে কাল বলিব। বলিয়া আপনার ঘরে শুইতে গেলেন।

১২

৪

কাহারও মুখে কথা নাই। আদরের প্রাণ ছিঁড়িয়া প্রাণের অতি গোপন স্থানে কে যেন আগ্নেয় অক্ষরে লিখিতেছিল, তাহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল, সে অনাথিনী হইতে চলিল, তাহার বড় সাধের বুকের ধন পর হইল।

আদর কতবার মনে করিল, স্বামীর পায় পড়িয়া খুব খানিক কাঁদে; কে যেন তাহাকে বলিয়া দিতেছিল, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিলে মনের আগুনে জল পড়ে। কিন্তু কে জানে, কেন বালিকার কাঁদিবার সাহসটুকুও কুলাইয়া উঠিতেছিল না।

শ্যামাচরণ ভাবিতেছিলেন, স্রষ্টার সংসারসৃষ্টি কি এই ভাবে? শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব, তাহাদের মনুষ্যত্বের ভাগ এত অল্প। বালির বাঁধের মত সামান্য আঘাত পাইলেই মিশাইয়া যায়; আপনার কর্ত্তব্য জ্ঞান হারাইয়া ফেলে; জীবনের সুসারে,—শান্তি, তাহার অযাচিত আলিঙ্গন স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করে,

প্রাণে কোন অভাব ছিল না, কাল-প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়া, বেশ চলিয়াছিলাম, কোথা হইতে একটা তরঙ্গ উঠিয়া সরল স্রোতের রূপান্তর করিয়া দিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িলাম। উচ্চশিক্ষাগর্ব, অতলে ডুবিয়া গেল।

"আদর!"

"কি।"

আদর যে স্বরে উত্তর দিল, তেমন মনোরম, তেমন মর্মস্পর্শী স্বর, শ্যামাচরণ কখনও শোনেন নাই।

"আদর! কাঁদিতেছ? কাঁদ! তোমার কাঁদিবার দিন বটে? তোমার আর কে আছে? মনে পড়ে কি? পিতার মরিবার সময়ের উপদেশ মনে পড়ে কি? কার্য্যগত শিক্ষা ব্যতীত, মনুষ্যের ভবিষ্যৎ নিরাপদ হইতে পারে না, কল্পনাগত শিক্ষায় আমার যথেষ্ট অধিকার! ম্যাটসিনী, গ্যারিবল্ডি প্রভৃতি মহাত্মাদের জীবনচরিত পড়িয়া স্থির করিয়াছিলাম, দেশের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিব, বাহ্য দুখের প্রলোভন মনে আসিলে দূর করিয়া দিব। প্রলোভনের আঘাত কখনও পাই নাই। জানি-

জান না, সামান্য আঘাতে এতদূর উন্মাদ করিয়া তোলে। যে মহাত্মা বলেন, বই পড়া জ্ঞানের দ্বারা বাহ্য ও অন্তর্জগতের যা কিছু প্রলোভন, ফেলিয়া দিয়া, আপনার কর্ত্তব্য বজায় করিয়া চলা যায়, তাঁহাকে আমি মূর্খের অপেক্ষাও মূর্খ মনে। কার্য্যগত ও কল্পনাগত শিক্ষাকে ওজন করিলে, কার্য্যগত শিক্ষা, কল্পনাগত শিক্ষা অপেক্ষা লক্ষগুণে ভারি হয়। অনেকে হয় ত দুর্ব্বল হৃদয় বলিয়া আমাকে উপেক্ষা করিতে পারে। কিন্তু কে উপহাসের পাত্র, সময়ে প্রকাশ পায়। আদর! তোমার মত স্ত্রীলাভ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? পৃথিবীতে নির্দ্দোষ সুন্দর হয় না, একটা না একটা খুঁত থাকেই। কিন্তু তুমি রূপে গুণে নির্দ্দোষ সুন্দর! স্ত্রীজাতির আদর্শ। স্থির জানিও, জগদীশ্বর তোমাকে সহজে অনাথিনী করিবেন না। তবে যদি তোমার ভিতর কোন পঙ্কিল কর্ম্মছায়া থাকে, পরিণামে কি দাঁড়ায় বলিতে পারি না। আমার বিষয়ও তোমাকে দৃঢ় করিয়া বলিতে পারি, প্রাণের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিব; দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকিতে পরাজয় স্বীকার করিব না। আদর! তোমায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই,

আজও বলিব না। যা বলিতেছি শোন, আমি মজিয়াছি। জানি না, কি কুহকে আকর্ষিত হইয়া চলিতেছি। পরস্ত্রীর আকর্ষণ এত ভয়ানক, মানুষ এত সহজে পাগল হয়, তাহা জানিতাম না। আমার ধারণা ছিল, স্ত্রীজাতি অতি কোমল, ফুলের দিক দিয়া যায় না; কুটিল ধরায় অতি সন্তর্পণে পা ফেলে; ফুলটী শোঁকে, তাও পোকা বের দিয়া। মানুষ মজে তাহাদের কুহকে নয়, নিজের দোষে। কিন্তু দেখিলাম সে ধারণা আমার সম্পূর্ণ ভুল। পুরুষ ত পতঙ্গ, হাবভাব কটাক্ষের আগুন জ্বালিয়া, অতি সহজে টানিয়া লয়। দিশাহারা হইয়া পুরুষ পুড়িয়া মরে। আদর! উপায়? তোমার কাছে সরল প্রাণে স্বীকার করিতেছি, আমি দোষী, আমি বিশ্বাসঘাতক, আমার নরকে স্থান নাই। বোধ হয় আমি ভাসিলাম।

আদর মাথা নিচু করিয়া কাঁদিতেছিল, চুপ করিল। মুখ তুলিয়া বলিল, 'তুমি যদি ভাসিয়া যাও, আমিও ভাসিব, তাহাতে আমার দুঃখ কি? কিন্তু তুমি ভাসিবে, এ দুঃখ আমার মরিলেও যাইবে না। তোমায় আমায়

সম্বন্ধ জান ত! তুমি যদি রাজা হও, আমি রাণী হইব। তবু তোমার খাবার সময়ে আসনটুকু না পাতিয়া দিলে, খাইতে বসিলে তোমার পাতের সামনে বসিয়া পাখা না নাড়িলে, আমার রাণী হইয়াও সুখ হইবে না। তুমি যদি গাছতলায় থাক, আমি—বাপ মা, আত্মীয়, সুখসম্পদ সমস্ত ছাড়িয়া তোমার কাছে আসিয়া, তোমার পদসেবা করিব। ইহজন্মের আর আমার কর্ম্ম কি? তাহাতে আমার নূতন কষ্ট কি? সহিবার জন্যই আমরা জন্মিয়াছি। তোমায় আমি কি বুঝাইব—আমার কি জ্ঞান? রামায়ণ, মহাভারতে যে কটা চরিত্র দেখিয়াছি, সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা, আরও কত,—সকলেই স্বামীর জন্য কত সহিয়াছেন। স্বামীর জন্য, আপনার প্রাণ অস্তি তুচ্ছ করিয়া বিলাইয়াছেন। তবে আমার জন্য ভাবিতেছ কেন? আমরা হিন্দুর ঘরের মেয়ে, আমাদের অসাধ্য কি? যদি তোমার মাথার একগাছি চুলের জন্য, আমার বুকের সমস্ত রক্তটা দিতে হয়, হাসিমুখে দিব। কাতরতার একটু চিহ্নও দেখিবে না। তবে ভয় এই, ভাবনা এই, তুমি কেমন করিয়া কষ্ট সহ্য করিবে? দুঃখে দুঃখে-

তুমি আত্মঘাতী হইবে। আর সকলে তোমাকে ঘৃণিত বলিয়া ঠেলিয়া রাখিবে, সে যেন আমি কেমন করিয়া বুকে ধরিব? তুমি আমার চোকে চোকে থাক। চোখের নেশা কাটিয়া যাইবে। যদি আমার কাছে থাক, স্বর্গে এমন দেবী নাই, নরকে এমন রাক্ষসী নাই, আমার বুকের ধন, ছিনাইয়া লইয়া যায়। তোমার পায়ে ধরিতেছি, আমার এই অনুরোধটী রাখ! মা, সকল কথা শুনিলে, প্রাণে বাঁচিবেন না।

আদরের করুণ-বিগলিত মুখখানি দেখিয়া, শ্যামাচরণ বড় ব্যথিত হইলেন। কহিলেন "দেখ আদর! যখন পুণ্যের সংসারে পাপ ঢুকিয়াছে, তখন আর রক্ষা নাই। যত্ন করিয়াই আটে ঘাটে বাঁধ, রক্ষার সম্ভাবনা খুব অল্প। মানুষ যখন প্রথম পাপে প্রবর্তিত হয়, মধ্যে মধ্যে অনুতাপ প্রাণে জাগিয়া উঠে বটে, কিন্তু তার স্থিতি অতি অল্পকাল। ক্রমে পাপকাজ সরল হইয়া, তৃষ্ণার সময় জলটুকু খাওয়ার মত সহজ ও প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। ক্রমে একদিনের তরেও, এক সময়, অনুতাপের লেশও প্রাণে জাগে না। তবে শেষ দিন যেদিন ইহজন্মের পাপ পুণ্য

ফুরাইয়া যায়, মান, গর্ব্ব, অহঙ্কার, অর্থপিপাসা, আলাপ, প্রণয়, লোকাচার, পৃথিবীর যা কিছু, সব ডুবিয়া যায়,—আত্মপর, আলো, অন্ধকার, চন্দ্র, সূর্য্য, চোখের উপর সমান হয়, সেই দিন কি হয় বলা যায় না। বোধ হয়, কেবল একটা পাঁজরা-ভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িয়া সব শেষ হইয়া যায়। সে নিশ্বাসের সঙ্গে অজস্র অনুতাপ, পূর্ণ মাত্রায় ফুটিয়া, মনে হয়, মরিয়াও কি এ স্মৃতির বিষ দূর করিতে পারিব? আমিও এই প্রথম পাপে মজিতেছি। তাই বুঝি এই অনুতাপের ধারা প্রাণে বহিতেছে। বলিতে পারি না, ইহার স্থায়িত্ব কতদূর!"

আনন্দ। দেখ আমার কাঁদিবার দিন বটে! কিন্তু আজ কাঁদিব না! কাঁদিতে হয় পরে কাঁদিব। একটা কথা তোমাকে বলি, এখনও সাবধান হও, পথ আছে; একবার পা পিছলাইলে আর উপায় নাই।

শ্যামা। সব বুঝিতেছি, চোখের উপর সব দেখিতেছি! কি মনের বেগ, তার উপর ত হাত নাই। মানুষের দেহে, কুপ্রবৃত্তি সকল সময় অধিকার করিয়া থাকে, কিন্তু বিবেক একবার, শুধু—একবার আসিয়া

চেতন দিয়া যায়। "সাবধান ওপথে চলিও না; কাঁটার ছড় একবার লাগিলে আর রক্ষা নাই।" যাহার কার্য্যগত শিক্ষা আছে, সেই আত্মরক্ষা করিতে পারে। আর যে কল্পনাগত শিক্ষা মনে করিয়া, বাহ্য জগতের উপর একটা ঘৃণার দৃষ্টি হানিয়া বসিয়া থাকে, তাহারই সর্ব্বনাশ। আমার এখন কিরূপ অবস্থা জান? ঘরের চারিধারে আগুন জ্বলিয়াছে, মধ্যে আমি আছি। যদি ছুটিয়া পালাই, পুড়িয়া মরিব, আর যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলেও ঐ দশা। যৌবনে অভিভাবক না থাকিলে, মানুষ প্রায়ই কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়।

আদর। মনে আছে কি? তোমার হাতে ধরিয়া বলিয়াছিলাম, সংসর্গে মিশিও না। তুমি আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলে। সংসর্গ দোষ কেমন দেখ! একদিনে তোমাকে পশু করিল।

শ্যামা। দেখ আদর! শুধু তোমার নয় অনেকেরই ঐ ধারণা, সংসর্গে মানুষ খারাপ হয় কিন্তু আমার বিবেচনায় ওটা সম্পূর্ণ ভুল। আমি বলি আমার

কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন না দিই, বিবেকের অনাদর না করি, তবে কে আমার ভাবান্তর করিতে পারে? আজ আমার মনে যে ঝড় উঠিয়াছে, কই আমার সংসর্গের দুই একজন আসিয়া, থামাক্ দেখি! যেমন নামাইতে পারে না, তেমনি উঠাইতেও পারে না! এ কেবল অন্ধ মনের ভ্রমধারণা মাত্র। আমার বিশ্বাস, আপনার ভাল মন্দ আপনার হাতে। মানুষ বুঝিয়া চলে না, তাই পরিণামে দুঃখ ভোগ করে।

আদর। তুমি অনেক বই পড়িয়াছ, সকলে তোমাকে বিদ্বান বলিয়া মান্য করে। তোমার জ্ঞানের এক ফোঁটাও আমার নাই। কিন্তু এ বিষয়ে যা বুঝিয়াছ, ঠিক কি? নিজের ভাল মন্দ নিজের হাতে বটে, কিন্তু সংসর্গে মন্দ করে না কি? আগুণে ঘি না পড়িলে, বাড়িতে পায় কি? মানুষ প্রথমে কুপথে গেলে, বরং আপনা আপনি ফিরিতে পারে, কিন্তু সংসর্গের উপসর্গ জুটিলে আর উপায় নাই। এই যে তোমার বাগানে ভোজ হইল, বাইনাচ হইল, এ সকল কি তোমার ইচ্ছায়, না তোমার সঙ্গীদের

অনুরোধে? তুমি যদি ও সকল উপসর্গ হইতে তফাৎ থাকিতে তাহা হইলে কি বাইজীর গান শুনিয়া মজিতে? তুমি আমাকে যেমন করিয়াই বোঝাও, আমি কিন্তু বুঝিব না। সংসর্গে সব যায়; তুমি গেলে, অনেকে যাইতেছে, ক্রমে পৃথিবী যাইবে। দেখ, এত দুঃখেও আমার হাসি আসিতেছে, একটা কথা আমাকে বুঝাইয়া দাও, তোমাদের মন এমন কেন? তোমরা পুরুষ, মন দৃঢ় হইবে, আপনার ভরে অটল রহিবে, হাজার ঝড় ঝাপটা আসিলেও, আপনার পুরুষত্ব হারাইবে না, তা নয়, কোথাও একটু কিছু নূতন দেখিলেই ছুটীয়া যাও। আমরা বটে চঞ্চল, মনের স্থিরতা নাই, কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, বুঝিতে পারি না, তবু আমাদের মনে কখনও রূপান্তর হয় না। পৃথিবীর যেখানে যত কিছু প্রলোভন আছে, এক সঙ্গে জড় করিয়া চোখের সাম্‌নে আনিয়া ধর দেখি,—আমাদের মন, একটুও টলিবে না। কিন্তু তুমি যদি একটীবার মুখের কথা খসাইয়া বল, একটু ইসারায় জানাও, তোমার পা

বুকে ধরিয়া হাসিতে হাসিতে মরিব। আমাকে বুঝাইয়া দাও আমাদের যত্নে, কেন তোমাদের মন উঠে না? আমরা ছল জানি না। মুখের অনর্থক সোহাগ দেখাইতে পারি না, প্রাণে বিষের ছুরী রাখিয়া হাসির লহর তুলিতে পারি না, তাই কি আমরা হেলনার জিনিশ? শুনিয়াছি মানুষ মজে রূপে, গুণে ও যত্নে। আমাকে বুঝাইয়া দাও, তুমি কি দেখিয়া মজিয়াছ? তুমি এক দিনে, তার গুণ এমন কি বুঝিলে বা এমন কি যত্ন পাইলে, যে আপনার প্রাণটা তার পায় রাখিয়া আসিলে? তবে এক কথা, যদি সে রূপবতী হয়, তার রূপে মজিয়াছ। কিন্তু রূপ কি ভয়ানক জিনিষ তুমি ত জান? মানুষ পোকার মত রূপের আগুনে পুড়িয়া মরে। অত পড়িয়া, অত জ্ঞান পাইয়া, যদি তুমি রূপ দেখিয়া মর, তবে তোমার পড়া-শুনার মুখে ছাই, আর তোমারও—, ছি! ছি! ছি! কি বলিতে কি বলিতেছি! স্বামি! পতি! সর্ব্বস্বধন! অপরাধ লইও না। আমি কেমন হইয়াছি! তাই যা তা

বলিতেছি ! যখন প্রথম শ্বশুরঘর করিতে আসি, তখন হইতে যদি তোমার স্বভাব খারাপ দেখিতাম তাহা হইলে এতটা লাগিত না। এ প্রথম কি না, তাই এত বাজিয়াছে। তুমি যা কর, আমায় পায়ে ঠেলিও না। তোমা বই আমার আর কে আছে।

আদর স্বামীর পায়ে লুটাইয়া, মলিন মালার মত কাঁদিতে লাগিল; কান্না আর ফুরায় না, আহা! বালিকার চোখে এত জল কোথায় ছিল!

শ্যামা। আদর! কাঁদিও না আমার কথা শোন! দেখ! জগৎব্যাপার বড় বিচিত্র। সাধে বিষাদ, সাধনায় স্বার্থ, রূপে মোহ, আরও কত দেখিয়া সৃষ্টির অপূর্ণতা মানিয়া লইতে হয়। মানুষকে জ্ঞানের আধার করিয়া, জগদীশ্বর পশুত্বে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। জগৎজীবের অবস্থা কিরূপ জান? যেমন কেহ সাঁতার জানে না, তাহাকে জলে ফেলিয়া দিলে, সে যেমন আকুলি ব্যাকুলি করিয়া মরে, জগৎজীবের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ।

ঈশ্বর মায়া মোহের সমুদ্রে আমাদিগকে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। যে কেহ আপনার সুপ্রবৃত্তির বলে, কুপ্রবৃত্তির জঞ্জাল ঠেলিয়া দিয়া উঠিতে পারে, সেই বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সে খুব কম। লাখেকের ভিতর একটা কিনা সন্দেহ। এরূপ স্থলে, জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি, বড় কিছু করিতে পারে না। বুদ্ধি প্রধান উপকরণ হইয়াও এ পরীক্ষার সংসারে পড়িয়া মানুষের তাই এত হাহাকার।

আরও এ কথা সে কথা ঢের কথা হইল।

আদর চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। মুখে একটী কথা নাই। পুরুষের বুকে প্রকৃতির মত স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া, আদর সব কথা শুনিতে লাগিল। তেমন মধুর, তেমন মর্ম্মস্পর্শী কথার স্বাদ সে বুঝি কখনও পায় নাই।

ঘড়িতে তিনটা বাজিল। পাঁচরকম চিন্তায় নানান মনের আবেগে, শ্যামাচরণের মাথাটা কেমন হইয়া গিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "আদর! আজ আমি শুই; আমার বুকটা কেমন করিতেছে। হাত দিয়া দেখ ত"।

আদর

শ্যামাচরণ শয়ন করিলেন। আদর বুকে হাত বুলাইতে লাগিল। মর্মান্তিক আগ্রহে ডাকিল "ভগবান! আমার আর কে আছে? জীবনের একটা সাধও মেটে নাই; প্রাণের একটা আকাঙ্ক্ষাও পোরে নাই; পতি-প্রেমের পবিত্রতা যেন ভাল করিয়া উপভোগ করিতে পারি"।

আদরের দুটী চোখে, দু-ফোঁটা জল। বুঝি দেহের সমস্ত শোণিত দু-ফোঁটা জল হইয়া চোখে ফুটিল,—ঝরিল না ভগবান্! তোমার আসন টলিল কি?

৫

অশান্তির আন্দোলনে, কল্পনার দুঃস্বপ্নে, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের দ্বন্দ্বে, নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া শ্যামাচরণের সে রাত্রি কাটিল।

সারাদিন আদর শ্যামাচরণকে একটীবারও কাছছাড়া করে নাই। যেন জগতের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া,—দুর্ভাগ্যের কঠোর আলিঙ্গন হইতে কাড়িয়া লইয়া, বুকের ভিতর বুক ঢাকা দিয়া সে তাহার প্রাণপতিকে রাখিয়াছিল।

ব্যাপার এতটা গড়াইয়াছে,—রাজেশ্বরী তাহা জানিতেন না। সমস্ত দিনের পর, শ্যামাচরণ একবার বহির্বাটীতে আসিলেন। আদর তখনও ছাড়িতে চাহে নাই। শ্যামাচরণ বলিলেন, "আদর! আর অবিশ্বাস করিও না, ছাড়িয়া দাও। আমি আমার প্রাণ বাঁধিয়াছি।" আদর আর জেদ করিল না, বলিল, "ওই কথাই আমার যথেষ্ট। তুমি যখন মুখে বলিতেছ,

তুমি তোমার প্রাণ বাঁধিয়াছ, আর আমার বলিবার কি আছে? তোমার বিশ্বাস তোমার হাতে। এ বিশ্বাস ভাঙ্গিলে, জানিব, আমি তোমার স্ত্রী হইবার যোগ্যা নই।"

সন্ধ্যা হইয়াছে, রাস্তায় গ্যাসের আলো তখনও জ্বলে নাই, কাছের মানুষ ভাল করিয়া দেখিলে চেনা যায়। শ্যামাচরণ আপনার বাহিরের ঘরে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, "জীবনের মধ্য প্রান্তে আসিয়াছি। সারা মধ্যাহ্ন,—শিক্ষার সুসার ধরিবার জন্য কাটাইলাম, পরিণাম এই? মনের বেগ ফিরাইতে পারিব না? যদি না পারি, তবে উচ্চশিক্ষার ফল কি? সামাজিক কঠোরতা, সাধারণের সহানুভূতি, মানব-চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত, এ সকলের পূর্ণ প্রতিবিম্ব দেখিবার জন্য, এত অর্থব্যয়, এত শ্রমস্বীকার, কেবল এক কার্য্যগত শিক্ষার অভাবে, সব জলাঞ্জলি যাইবে? এত সাধের বর্দ্ধিত জীবন, তবে কি ভ্রমে ভরাইয়াছি? নিষ্ফল কল্পনায়, প্রাণের গ্রন্থি বাঁধিবার প্রয়াস পাইয়াছি? প্রবৃত্তির আগুন ছাই চাপিয়া

রাখিয়াছি? না— এ ধারণার মূলে আঘাত দেওয়া উচিত। আমি দেখাইব, যার উচ্চশিক্ষা আছে, তাহার মন, একটা অজ্ঞান পশুর সমান হয় না। প্রথম আকর্ষণে, প্রাণ একটু টলিয়াছিল বটে, কিন্তু তার কারণ আছে। যে কখনও আলো দেখে নাই, কেবল শুনিয়াছে, তাহার চোখে, যদি প্রথম আলো আসে, সে চোখ কি ঝলসায় না? আমারও ঠিক সেইরূপ অবস্থা। প্রান্তরে পরিশ্রান্ত পথিক আলেয়া দেখিলে বিজ্ঞানের দৃষ্টি তাহার যতই উন্নত হউক, প্রথমে কি সে বিচলিত হয় না? দূরস্থিত কুটীরের আলো মনে করিয়া, কি সে ছোটে না? যার জ্ঞান নাই, শিক্ষা নাই, সে সেই আলো ধরিতে ছুটিয়া ছুটিয়া, শেষে প্রাণ হারায়; আর যাহার জ্ঞান আছে, শিক্ষা আছে, কর্ত্তব্য বোধ আছে, সে অবস্থা বুঝিয়া ফিরিয়া আসে।

এমন সময়, তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত উকীল বন্ধু শ্যামকান্ত লাহিড়ী, যাঁহার প্রথম হইতেই কামনা যে "একবার একটু মদ ও মেয়েমানুষের চার

ধরাইতে পারিলে হয়," তিনিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্যামাচরণের কাণে কাণে কি বলাতে, শ্যামাচরণ উত্তর করিলেন, "ভাই, যদি আমার শত্রু হও, তবে তাহার সহিত দেখা করিতে অনুরোধ করিও। তুমি জাননা, আমার মনের কি অবস্থা হইয়াছে, যদি প্রাণ দেখাইবার হইত, শ্মশানের প্রতিকৃতি দেখাইতাম। বড় আদরের, আদরের চোখে জল দেখিয়াছি, শেল বিঁধিয়াছে। বুকের সমস্ত রক্ত ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দিতে পারিব, যার আমি বই নাই, তার হাসি লুটাইয়া নিতে পারিব না। ভাই! সময়ে বাপ মার দরদ হারাইতে হয়, কিন্তু চিরজীবনের হেনস্থাতে স্ত্রীর ভালবাসা লয় পায় না।"

শ্যামাকান্ত কথা চাপা দিয়া বলিলেন, "আমি ত আর তোমাকে তার বাড়ী যাইবার কথা বলিতেছি না, তুমি ভাবুক, মেয়েমানুষের মান জান ত। তোমার বাড়ীর দুয়ারে গাড়ী করিয়া আসিয়াছে, কেবল একবার তোমায় দেখিয়া যাইবে, এই আশা

করিয়া আসিয়াছে, সে সাধে বঞ্চিত করিও না।
একবার দেখা করিয়া আসিবে, তাহাতে ক্ষতি কি?
যদি আমাকে ভালবাস, এ অনুরোধ ঠেলিও না"—
বলিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া শ্যামাচরণকে উঠাইলেন,
শ্যামাচরণ কি জানি কেন, আর কোনও কথা কহিলেন
না, সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। চকিতে একবার মনে উদয়
হইয়াছিল, "আদর"। প্রবৃত্তির মোহ উত্তর দিল,
"ক্ষতি কি? একবার দেখা করিয়া চলিয়া আসিব
মাত্র।"

বাড়ীর কিছু দূরে গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল; শ্যামকান্ত
শ্যামাচরণকে লইয়া, গাড়ির কাছে আসিলেন। ছুটো
একটা নীচ রসিকতাও করিলেন। হীরাবাই—একরাশি
রূপ লইয়া, এক মুখ হাসি লইয়া, প্রাণভরা সোহাগ
লইয়া, সেই ভাষা—আধ হিন্দি, আধ বাঙ্গালাতে
বলিল, "আপনাকে যেতে বলেছিলেম, বোধ হয়
আপনি যেতেন। আমি আর থাকতে পারলেম না।
আমার প্রাণ বড় খারাপ হ'ল। তাই ছুটে
এলেম।"

শ্যামাচরণের মুখে কথা নাই, তাঁহার বোধ হইতেছিল, যেন পৃথিবী কাঁপিতেছে; বাসুকি আপনার স্থান ছাড়িয়া, মাথা তুলিয়া, তাঁহার বুকের ভিতর সহস্র ফণা বিছাইয়াছে। অদৃশ্য দংশন, ফুটিবার যো নাই। মর্ম্মস্থল ক্ষত বিক্ষত। দুকথা বলিবার, সে শক্তিও নাই। এ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা, কেহ বুঝিবে কি? হীরাবাই শ্যামাচরণের হাত ধরিয়া টানিয়া, গাড়িতে উঠাইয়া, আপনার পাশে বসাইল। শ্যামকান্তও তাড়াতাড়ি উঠিয়া গাড়ির আর এক পাশে বসিলেন। হুকুম হইল, "হাঁকাও"। গাড়ি ছুটিল।

এই কারণেই বর্ত্তমান যুগ লোকের প্রিয়ই বল, অপ্রিয়ই বল, দাঁড়াইয়াছে! যদি কখনও, একটা ভাল কাজ করিতে মন যায়, যাহাতে আমার নাম আছে, পুণ্য আছে, দশের হিত আছে, দেশের উপকার আছে, তাহাতে কতদিক হইতে, কত বাধা আসিয়া পড়িবে। অনেকে বলিবে, "আমি স্বার্থপর", অনেকে বলিবে, "ভিতরে আমার কিছু মতলব আছে, নহিলে একটা অযাচিত অনুগ্রহ কেন? ঘরে কি পয়সা

রাখিবার জায়গা নাই ?" অনেকে হয়ত আমায় চোর বদনাম শুদ্ধ ঘটাইবে।

যদি সে সকল কথা কাণে না তুলিয়া, কেবল সমাজের মুখ চাহিয়া, জনস্রোত ও কার্য্যস্রোত ঠেলিয়া, আমার ক্ষুদ্র সঙ্কল্প তরণিখানি, লইয়া যাইতে চাই,—কোথা হইতে অজানিত এক ঢেউ আসিয়া, সব ভাসাইয়া দিবে। আমায় পরকাল সুখ চিন্তাটুকু হইতে বঞ্চিত করিবে।

কিন্তু মন যদি, কোনও একটা মন্দ কাজের প্রশ্রয় লইতে চায়, যাহাতে আমার সম্পূর্ণ ক্ষতি, অথচ এত বড় জগতের, একটী সামান্য কীটেরও বিন্দু উপকার নাই,—সে কাজে, আমি চারিদিকে পথ পাইব! যাহার সহিত কখনও মুখ দেখাদেখি নাই, যিনি পায়ে ব্যথা লাগিবে বলিয়া, মাটিতে পা ফেলেন না, তিনি নিতান্ত আপনার হইয়া, আমার সহায় হইবেন। সংসার সাগরের একটী অণু আমি, আমাকে বিরাট-মুর্ত্তি করিয়া, প্রাণে অহংজ্ঞান আনিয়া দিবে,—লক্ষ্যের পথ দেখাইবে বলিয়া, লক্ষ্যভ্রষ্ট করিবে। মূঢ় মন,

কাল মাহাত্ম্য না বুঝিয়া, কুটিল পন্থায় মজিবে। স্বেচ্ছায় হাতে গরল লইবে।

বলিতে পারি না, সংসারের এ কর্ত্তব্যহীন নিষ্ফলতা ও অসফলতা কার সৃষ্টি? দেবতার কি পিশাচের।

শ্যামাচরণ কুপ্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া ক্ষীণ কর্ত্তব্যের আলো পাইয়াছিলেন। আত্মগ্লানির লাঞ্ছনায়, হয়ত আত্মজয় করিতে পারিতেন। কুটিল কল্পনা, হয়ত পবিত্রতার স্পর্শে, মুছিতে পারিতেন। শোকাবহ পরিণাম, হয়ত অন্তরঙ্গ আতঙ্কে, দূরে রাখিতে পারিতেন—কিন্তু অজানিত দৈবের প্রবাহে, সব ভাসিয়া গেল। সাধু উদ্দেশ্যের মূলে কুঠারাঘাত হইল। অধর্ম্ম জয়পতাকা তুলিল। তাই বলিতেছিলাম, বর্ত্তমান যুগ, এই কারণেই লোকের প্রিয়ই বল, অপ্রিয়ই বল, দাঁড়াইয়াছে।

এস্থলে অনেকের অনেক তর্কযুক্তি উঠিবে। বিজ্ঞ-সমালোচকের কঠোর তাড়নে, হয়ত আমার এ ক্ষুদ্র উদ্যম কোথায় ভাসিয়া যাইবে, নবীন কবির শ্লেষ হাসির লহরে, হয়ত আমার হাসির লীলা খেলা ফুরা-

হইবে, সাহিত্য-জগতের কুসুমাবৃত পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া, হয়ত কেবল কাঁটা ফোটা সার হইবে। যে শ্যামাচরণ আপনার উচ্চশিক্ষার গুণে আত্মজয় করিয়া, কুপ্রবৃত্তি মন হইতে দূর করিবার সঙ্কল্প দৃঢ় করিলেন,—কর্তব্য অকর্তব্যের সহিত, ঘোরতর যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কর্তব্যের পূর্ণতা রক্ষার জন্ম, বদ্ধমূল হইলেন। অসার রূপমোহ, যে কেবল পশু প্রকৃতির জন্ম সৃষ্টি, যে জীবন শিক্ষার সুসার ধরিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে, সে জীবনের জন্ম নয়। এ ধারণার আশ্রয় লইয়া, সেই শ্যামাচরণ, উদ্দেশ্য ভুলিয়া, কর্তব্য ভুলিয়া, চিরজীবনের শিক্ষা জলাঞ্জলি দিয়া, মূর্খের মত, রূপের অনুসরণ করিল? কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল, তথায় অগ্রসর না হইয়া, নরকের অন্ধকার আলিঙ্গন করিতে চলিল? সংসারের কুটিল চক্রে উচ্চ নীচ সমান হইল? তা হয়! হয়ত কোন সময়ে প্রাণে একটী সোনার স্বপ্ন আসিয়াছিল, বুকের উপর দিয়া কিসের একটা লহর বহিয়া গিয়াছিল, সাধের সমুদ্র উছলিয়া উঠিয়াছিল, সেই অবধি প্রাণে একটা, যুগ যুগান্তরের অতৃপ্ত পিপাসা

রহিয়া গিয়াছে। সে কে তা জানিনা, তাহাকে কবে দেখিয়াছি মনে হয় না, কে জানে আর কখনও দেখা হইবে কি না, যদি কখনও সে স্বপ্নের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা চকিতের ন্যায় চোখের উপর আসে, বহুদিনের নির্ব্বাণ কল্পনার দীপ হাসে, সাধনার পরম বিধি, সাধিয়া, সাড়া দিয়া, প্রাণের উপর ভাসে, কর্ত্তব্য, শিক্ষা, নীতি, জ্ঞান আরও যত কিছু এ সকল ত অতি তুচ্ছ, স্বর্গে যে সৌন্দর্য্য নাই, ফুলশরে সে মোহিনী নাই, প্রলোভনে সে আকর্ষণ নাই, সেই অতৃপ্ত রূপমোহ হইতে মন টলাইতে পারে। আপনার স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিতে পারে।

আর কাল-মাহাত্ম্যের কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে মন্দ কাজে সহানুভূতি সহজে মেলে। এ সময় এরূপ যোগাযোগ না হইলে, শ্যামাচরণের অধঃপতন হইত কি? ক্রমে আদর শুনিল—বাবু একখানি চাদর পর্য্যন্ত না লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। তার মাথায় বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

৬

দিন যায়! কাহারও হাসিয়া কাহারও কাঁদিয়া। হয়ত কাহারও সুখ ধরে না, সে আর সুখ চাহে না; আবার হয়ত কাহারও দুঃখ ধরে না, সে আর দুঃখ চাহে না;—সুখে হ'ক, দুঃখে হ'ক হাসিয়া হ'ক, কাঁদিয়া হ'ক, দিন যায়।

কিন্তু পৃথিবীর কেমন একটা ধারা, হাসি কান্না চিরদিন সমান যায় না। সুখের সাগরে ভাসিয়া, সাধের অনন্তশয্যায় শুইয়া, খ্যাতির বিচিত্র পতাকা উড়াইয়া,—মোহ নিদ্রায় অচেতন আছি। স্বপ্নেও ভাবি নাই,—কার্য্য ক্ষেত্র প্রতিকূল হইয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে এত যত্নের ঘুম ভাঙ্গাইবে? বাসনার পবিত্র স্বপ্ন, সময়ে কোথায় মিলাইবে? বিলাসের অসারতা, কালের মোহিনী মন্ত্রে অদৃশ্য হইবে।

যে মুহূর্ত্তে আঘাত লাগিয়া, বুক ভাঙ্গিয়া পড়িল, পূর্ব্বে মনে হইয়াছিল, সুখের আস্বাদে

পূর্ণ পরিতৃপ্ত লাভ হইয়াছে,—আর সুখের আকাঙ্ক্ষা নাই, এ আবার কি? দারুণ পতন!

তখন পরিত্রাহি স্বরে চীৎকার করিতে হয়,—না—না, সুখ কোথায় তুমি? তোমায় চাই। তোমায় চাই! তোমার আশ্রয় চ্যুত হইলে বাঁচিব না! আর কি সুখ সাড়া দেয়? সে তার মোহিনী মূর্ত্তি দেখাইয়া, কল্পনার চিত্রিত ছবি, চোখের উপর ধরিয়া দিয়া মোহিত করিয়া, চলিয়া গিয়াছে। সাধিয়া কাঁদিয়া মরিলেও আর সে দেখা দেয় না।

উপায় নাই। দায়ে পড়িয়া ডাকিতে হয়, "কোথা মৃত্যু,—আলিঙ্গন দাও। এ যন্ত্রণা কি সহ্য হয়?"

মরণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, হাতে তুলিয়া বিষ লইলাম, আর একটি মুহূর্ত্ত মাত্র,—পৃথিবীর সহিত সব সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়,—বন্ধুত্ব, প্রেম, মান, লোকাচার, এ সকল জঞ্জাল, আর বহিতে হয় না, শান্তির পবিত্র ধাম লক্ষ্য করিয়া, এই চলিলাম। ঐ—যে—ঐ—সৌভাগ্যের উজ্জ্বল রেখা, ঈষৎ ফুটিল,

প্রেমময়ী মুখ, রঞ্জিত অধরে মধুর হাসি লইয়া, আবার দেখা দিল, শ্মশান প্রাণ, কল্পনার স্রোতে আবার ভাসিল।

তখনি বিষ পাত্র ছুড়িয়া ফেলিলাম, পরিত্যক্ত আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখিয়া, আবার বুক বাঁধিলাম, মৃত্যু অতি তুচ্ছ মনে করিয়া, তাহার আলিঙ্গন যাচ্ঞা করিয়াছিলাম!—হায়রে! আবার মরণে ভয় পাইলাম। এইরূপ গড়া ভাঙ্গা, হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, লইয়া সংসার সৃজিত। কে জানে সৃষ্টি পূর্ণ কি অপূর্ণ! কিন্তু দিন যায়। সুখে হ'ক দুঃখে হ'ক, হাসিয়া হ'ক, কাঁদিয়া হ'ক, দিন যায়।

আদর মনে করিত, স্বামীর তিন অদর্শনে সে বাঁচিবে না, স্বামী কাছছাড়া হইলে, তাহার একটী দিনও কাটিবে না, পতিপ্রেমবঞ্চিতা বালিকা সেই মুহূর্ত্তেই মরিবে।

শ্যামাচরণ তিন দিন বাড়ী আসেন নাই। আদর সে শেল বুকে ধরিয়া, বাঁচিয়া আছে, সে

দাসী প্রাণে বহিয়া, আশার দাসী হইয়া ফিরিতেছে। যে দুঃখ, কল্পনায় আনিতে পারে নাই, সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখের সঙ্গিনী হইয়া, তাহার দিন কাটিতেছে।

তাই বলিতেছিলাম, দিন যায়। তুমি আমি মনে করি, কোনও একটা প্রাণের জিনিষ হারাইলে, বাসনার সাধের হার কণ্ঠচ্যুত হইলে, সাধনার পবিত্র স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে,—বাঁচিব না, দেহভার আর একদণ্ড বহিতে পারিব না, মাটীর শরীর মাটীতে মিশাইবে। কিন্তু কে জানে কি ঘোরে অঘোর হইয়া, কি ভোরে বিভোর হইয়া, নিরাশায় কি আশ্বাস বাঁধিয়া, মরণের শান্তিময় আলিঙ্গন গ্রহণে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। আবার বাঁচিবার সাধ হয় সুন্দর পৃথিবীর, সুন্দর শোভায় কেমন একটা মমতা জন্মায়। ধারণা অনেক সময় কার্য্যে পরিণত হয় না। তাই বলিতেছিলাম, দিন যায়। সুখে হ'ক দুঃখে হ'ক, হাসিয়া হ'ক, কাঁদিয়া হ'ক, দিন যায়।

আদরের এতদিন হাসিয়া গিয়াছে, এখন কাঁদিয়া

কাটিতেছে। আদরের মর্ম্মব্যথা কে বুঝিবে? স্বামী সোহাগের রাণী হইয়া, সে এখন কাঙ্গালিনী। পতি-প্রেমগরবিনী এখন চির-দুঃখিনী। চিরানন্দময়ী ফুল্ল প্রতিমা বিমলিনী, বিষাদিনী!

কে—কে পিশাচী, বালিকার সর্ব্বস্বধন হরিয়া লইয়া, তাহার ইহকাল পরকালে ছাই দিল?

রাজেশ্বরী আদরকে সান্ত্বনা করিবেন কি, আপনি প্রবোধ মানিতে পারিতেছিলেন না। এমন কি তাঁহার চরম কালের অবলম্বন, দেব দেবীর চিন্তা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

দুঃখে সুখ, বিপদে শান্তি, নিরাশায় আশা, নরকে নন্দন, সৌন্দর্য্যে স্বর্গ। সুন্দরী আদরের সহচরী। দুটিতে ভারি ভাব। দুটিতে মনের কথা বলাবলি করিত। দুটিতে দুজনের সুখ দুঃখের ভাগ লইত। দুটিতে আপনা আপনি হাসিত, কাঁদিত, কেহ জানিত না।

রাজেশ্বরীর সহিত সুন্দরীর মাতার কিরূপ দূর সম্বন্ধ ছিল। সেই সূত্রে পরস্পরের যাওয়া আসা ছিল।

আদর

সুন্দরী অভাগিনী বালবিধবা। বিবাহের ছয় মাস পরেই তাহার স্বামীর মৃত্যু হয়।

শ্যামাচরণ তিন দিন বাড়ী আসেন নাই। আদর একটি ফোঁটা জল পর্য্যন্ত মুখে দেয় নাই, একবার মুখ তুলিয়া চায় নাই, বড় সাধের স্বামী, একবার তাঁহাকে দেখিবে, মুখ ফুটিয়া এ কথাটিও বলে নাই।

সন্ধ্যার প্রাক্কাল, দিনের আলো নিবিয়া যায়, পাখির ডাক ফুরায়, পৃথিবীর, আঁধার প্রাণের আঁধার অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সোণার আদর ধুলায় পড়িয়া। সুন্দরী আদরের মাথা কোলে ধরিয়া, মুখ-চাহিয়া বসিয়া আছে।

দুটি সমব্যথির প্রাণে, কে যেন মর্ম্মান্তিক নিরাশার কালিমা ঢালিয়াছে, দুটির বুকভরা চাঁদের আলোয়, কে, যেন কলঙ্ক আঁকিয়াছে। দুটির আজন্মের সাধে, কে যেন, এ জন্মের মত বাদ সাধিয়াছে।

সুন্দরী বলিল, "আদর এরূপ করিলে আর কয়দিন বাঁচিবে?" আদর উত্তর করিল, "আমার

বাঁচিয়া সুখ কি ভাই? মানুষ বাঁচে সুখের জন্য। ইহকালের সকল সুখ ত আমার ফুরাইয়াছে।"

সুন্দরী। তবে কি মরিবে?

আদর। আহা! সেদিন কি আমার হইবে? সুখ যায়, সাধ ফুরায়, পোড়া প্রমাই ত ফুরায় না। মরণের আলিঙ্গনে সব জ্বালার অবসান। আমার জ্বালা জুড়াইবার সময় বুঝি এখন আসে নাই।

সুন্দরী। আদর, অবুঝ হইও না, আমার কথা শোন। মরণ আকাঙ্খা করিতেছ, কিন্তু এ মহাপাতক কাহাকে লাগিবে তা জান? যার সুখে তুমি সুখী, যার আদরে তুমি আদরিণী, যার সোহাগে তুমি সোহাগিনী, যে তোমার সব, সেই সর্ব্বস্ব-ধন স্বামী, তাঁহাকে এই পাতক লাগিবে। তোমার এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার উন্নতির পথে, প্রবল প্রতিরোধ হইয়া বসিতেছে, তোমার এক একটা ফোঁটা চখের জল, শত সহস্র শেল হইয়া, তাঁহার বুকে পড়িবার জন্য, প্রস্তুত হইয়া আছে। তুমি পতিপ্রেমপাগলিনী, প্রতিহিংসা পাগলিনী নও।

আদর উঠিয়া বসিল, লুণ্ঠিত কেশপাশ বাঁধিল, চোখ মুছিল, বলিল, "না—না—বল কি; ছি—ছি, আমি ত জানি না। আমার মরণের অনু-পাতক আমার স্বামীকে লাগিবে? আমার দীর্ঘ-শ্বাস আমার সর্ব্বস্বধনের উন্নতির পথ রোধ করিবে? আমার চোখের জল, আমার প্রাণপতির শেল হইয়া, তাঁর বুকে বাজিবে? ভাই! আর আমি মরণ কামনা করিব না, আর আমি কাঁদিব না, বুক যদি ফাটিয়া যায়, তবু একটুও জোরে নিশ্বাস ফেলিব না। আমার স্বামি! আমার পতি! আমার প্রাণেশ্বর! আমার ইহকাল, পরকাল তাঁহার অকল্যাণ হইবে?

সুন্দরী। তবে উঠ! যা হয় কিছু মুখে দাও।

আদর। তোমার হাতে ধরি, ও অনুরোধ করিও না। দুই চারি দিনের অনাহারে, মানুষ মরে না। আহা হা! ভাই! এ সর্ব্বনাশ কি কাহারও হয়! দুঃখ-জীবনের প্রথম উত্থানে, একবড়

পাপ, কি কেহ পায়? সাধের শুভ দর্শন, চকিতের মত একবার দেখা দিয়া,—এমন করিয়া কি মিলাইয়া যায়? যাঁহার পায়ে পড়িয়া মরিলে, অক্ষয় স্বর্গ,—যাঁহার মুখের কথায়, আপনার ইহকাল, পরকাল, শুভাশুভ, বিসর্জ্জন দিলে, পরম পুণ্য। জন্মজন্মের দেবতা, ইহকালের সুখ দুঃখ পরকালের পরম নিধি, সে আমার পর হইল? আমার আদরে, তাঁহার মন উঠিল না? আমার রূপে, তাঁহার মন ভরিল না? এ কথা কাহাকেও বলিবার নয়, এ জ্বালা কাহাকেও জানাইবার নয়। শুনিয়াছি, সুখ দুঃখের বিধানকর্ত্তা ভগবান্! ভাল মন্দের বিচারক বিধাতা। হাসি-কান্নার আশ্রয়দাতা পরমেশ্বর। বলিতে পারি না, বালিকার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাঁহার কি উদ্দেশ্য সাধন হইল? চিরজীবনের শান্তিটুকু কাড়িয়া লইয়া, তাঁহার সৃষ্টির কি উপকার হইল? এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক শেল হানিয়া, তাঁহার জগৎপিতা নামের কি সার্থকতা হইল? একবড়

আনন্দ

পৃথিবী, কোথাও কি একটু পরমাণু পড়িয়া আছে, জগতের কোন সুখ আকিঞ্চন করে না, কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ আনিতে চাহে না, কাহাকেও কখনও মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলে না। বিধাতা! তুমি যে রত্ন দিয়াছ, যে দেবতার সহিত এ অধিনীর, ইহকাল পরকাল বাঁধিয়া দিয়াছ, যাহার পায়ের কাঁটা তুলিয়া দিবার জন্য, আমার বুকে অক্ষয় বল দিয়াছ,—সেই পবিত্র বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিলে, এ তোমার কেমন লীলা? প্রাণভরা সোহাগ সমুদ্রে আগুন জ্বালিলে, এ তোমার কেমন করুণা? জীবনের প্রেম, প্রীতি, মান, আশা, ভালবাসা, সব ডুবাইলে, এ তোমার কেমন ছলনা? যদি তুমি দয়াময়, তবে এ অভাগিনীর প্রতি এত নির্মম কেন? যদি তুমি জগৎপিতা, তবে তোমার নিতান্ত চরণাশ্রিতা তনয়ার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ নাই কেন? যদি তুমি পাপ পুণ্যের বিচারক, তবে এ তাপিনীর, পাপ পুণ্য না বুঝিয়া এ দারুণ দণ্ড দিলে কেন?

আদর্শ

সুন্দরী! আদর! আর তোমার উপায় নাই,— তুমি আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিতেছ। পরমাত্মা পরমেশ্বরের উপর, দোষারোপ করিতেছ? তাঁহার বিশ্বব্যাপি-করুণায় কলঙ্ক ঢালিতেছ! তাঁহার নীতিরাজ্য ছলনা বলিয়া মনে স্থান দিতেছ? তোমার কর্ম্মফল তুমিই ভুগিতেছ বারবার মুখে শুনিয়াছি, অন্যান্য জাতির অপেক্ষা আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন জান? কোন কোন জাতি কেবল ইহকাল মানিয়া থাকে, আবার কোন কোন জাতিরও পরকালে আস্থা আছে,— কিন্তু আমরা ইহকাল, পরকাল, পূর্ব্বজন্ম, পরজন্ম, এ সকল বিশ্বাস করি, এই কারণে জাতির আদর্শ বলিয়া সাধারণ সমাজে আমরা পরিগণিত। তোমার কথা ছাড়িয়া দাও, আমার অবস্থা ভাবিয়া দেখ দেখি,—পুরাতন স্মৃতি টানিয়া আনিতে গেলে, চক্ষে জল আসে। পৃথিবীর ভাল মন্দ জানিতাম না, পাপ পুণ্য বুঝিতাম না, সুখ দুঃখের তারতম্য করিতাম না, কর্ম্মক্ষেত্রের অজ্ঞানিত

আদর

প্রবল আঘাতে নূতন জগত চোখের উপর উপস্থিত হইল। আদর করিয়া যখন স্বামী বুকে ধরিতেন, মুখে মুখ দিয়া যখন চোখে চোখ চাহিয়া থাকিতেন, বিভোর হইয়া যখন প্রাণের তরঙ্গ ঢালিয়া দিতেন, ভাবিতাম, এ সুখরাজ্যের অধিকারিণী চিরদিন থাকিব। পতিপ্রেম মণিময় মুকুট পরিয়া চিরগরবিনী হইয়া রহিব। বুকে বুকে মুখে মুখে এমনি করিয়া কাটাইব। কি রূপান্তর স্বর্গ হইতে শ্মশান, রাজেশ্বরী হইয়া ভিখারিণী, স্নেহ আদরিণী হইয়া চির অনাথিনী। বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে কোন পতিপ্রাণার বুক হইতে স্বামী কাড়িয়া লইয়াছি, হয় ত কাহারও মর্ম্মে ছুরি বসাইয়া, তাহার সকল সাধে ছাই দিয়াছি, হাসি মুখে হয় ত কাহাকেও পথের কাঙ্গালিনী করিয়াছি। এ জন্মে তাই কপাল পুড়িয়াছে; কতদিন এমন করিয়া জ্বলিতে হইবে, কে জানে! আদর! তোমায় আপনার ভগিনীর মত জ্ঞান করি,

প্রাণের অধিক ভালবাসি, তোমায় বিশেষ করিয়া বলিতেছি, ঈশ্বরে অবিশ্বাস আনিও না, আপনার পরিণাম বিষয়ে করিও না। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তুমি, তাঁহার রীতি নীতি লইয়া আলোচনা করিতেছ ?

আদর। ক্ষুদ্রমতি নারী আমি, তাঁহার মহিমা কি বুঝিব ভাই ! এ যন্ত্রণা রাখিবার স্থান, আমার হৃদয়ে নাই। বড় জ্বালায় এ সকল কথা মুখ দিয়া বাহির হইল ! যদি কখন দিন পাই, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিব, কি পাপে আমার এ সর্ব্বনাশ হইল কেন আমার নয়নের আলো নিভিয়া গেল ? কেন আমার প্রাণের কল্পনা বিদায় লইল ? ভাই ! তুমিও ব্যথিত, আমিও ব্যথিত, তুমিও কাঁদ, আমিও কাঁদি, যদি প্রাণের বোঝা অল্প পরিমাণেও নাবাইতে পারি।

আদর কাঁদিল, সুন্দরীও কাঁদিল, দুটি সমব্যথির প্রাণ একতারে বাজিল। এ

আনন্দ

করুণকাহিনী যদি কেহ বুঝিবার থাকে সে বুঝিবে।

দিন যায়। হাসিয়া হ'ক, কাঁদিয়া হ'ক, সুখে হ'ক দুঃখে হ'ক, দিন যায়।

৭

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল! তোমায় আমায় রূপান্তর না হইবে কেন? তোমার শিক্ষিত জীবন, স্বর্গীয় চরিত্র, নিষ্কলঙ্ক লোকাচার, নিষ্কাম ধর্ম্মপ্রিয়তা, সাধারণের আদর্শ বলিয়া খ্যাত; সংসারমাহাত্ম্যে ও কালমাহাত্ম্যে সে উচ্চশিক্ষা কোথায় ভাসিয়া গেল। দেবচরিত্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়া পশুত্বের পরিচয় দিতে লাগিল, অযাচিত লোকাচার জীবনের ভার বলিয়া বোধ হইল, পবিত্র ধর্ম্মানুরাগে, ভ্রুকুটী ও ক্লান্তি আসিল।

পিতা মাতার প্রগাঢ় ভক্তি, সন্তানে অতুল স্নেহ, সহোদরে পরম প্রীতি, সহধর্ম্মিণী যথার্থই অর্দ্ধাঙ্গিনী, আত্মীয় স্বজন নিতান্ত আপনার, সুখের সংসার, বেশ চলিয়া যাইতেছে,—অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিল,—কারণ এইরূপই ঘটিয়া থাকে। মনে হইল, এরূপ কোনও নিয়ম নাই, আমার পরিশ্রমের ধন পিতা মাতায়

স্বচ্ছন্দের জন্য চিরদিন উৎসর্গ করিব। সহোদর নহে৷
দরায় আপনার সংস্থান করিবার শক্তি নাই কেন?
"অনায়াসে পরের উপর ভর করিয়া চলিতেছে, কেন
মাথার ঘাম পায়ে ফেলি?" তাহার মনোভাব ত এই।
সন্তান যতদিন অনুপযুক্ত ছিল, আহার যোগাইয়াছি।
এখন বয়স হইয়াছে, আপনার অবস্থা বুঝিয়া চলুক।
স্ত্রী! এরূপ স্বার্থপর কি আর দ্বিতীয় আছে। যত
দিন তাহাকে স্বর্ণভূষায় ভূষিত করিবার অবস্থা
থাকিবে, বাঁদীর অধম হইয়া মন যোগাইবে। বিপদে
মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবে। ডান হাতখানা
কাটিয়া দিতে পারিবে, বিপদে গায়ের একখানা গহনা
খুলিয়া দিবে না। আত্মীয় স্বজন! যতদিন আমার
বাড়ীতে পাত পাড়িতে পারিবে, সময়ে অসময়ে
সাহায্য পাইবে, আমার আপনার হইয়া সর্ব্বস্ব
ত্যাগ করিবে, তারপর কে কার? পায়ে মাথা
খুঁড়িলেও মুখ তুলিয়া দেখিবে না।

এইরূপ কুৎসিত কল্পনার আশ্রয় লইয়া সোণার
সংসার, শ্মশানের প্রতিকৃতি ধারণ করিল।

পরিণামে যখন ধর্ম্মের জয় হইল, অধর্ম্মের ক্ষণস্থায়ী হুহুঙ্কার দূর হইয়া গেল, অসার আশার আবাসে যখন ছাই পড়িল,—অন্তরে তরঙ্গ, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ অনুতাপের অজস্র তরঙ্গ বহিল, মর্ম্মান্তিক উচ্ছাসে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তখন প্রবোধ মানিবার একমাত্র উপায়, কাতরস্বরে বলা,

ত্বয়া হৃশিকেশঃ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।"

বিদ্যোৎসাহী ধর্ম্মানুরাগী উন্নত চরিত্র যুবক শ্যামাচরণের কালচক্রে কিরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছে, আমরা তাহাই দেখাইতেছি।

পাপ সহচরী বারনারীর নাম শুনিলে শ্যামাচরণ জলিয়া উঠিতেন। মনে করিতেন, লোকে জানিয়া শুনিয়া, এতটা মূর্খ হয় কেন? মরিবার ত' অনেক উপায় আছে। মরণের নিকৃষ্ট পথ, বাছিয়া লয় কেন?"

যে রূপমোহ, নিতান্ত ঘৃণিত বলিয়া ঠেলিয়া রাখিতেন, সেই রূপের এখন তিনি দাসানুদাস, রূপের

সেবা একদণ্ড না করিলে, মনে হয় বাঁচিব না। সেই কুহকের অনুগামী হইয়া সংসার, স্বজন, ধর্ম, আদর, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। সুরারাক্ষসীর পৈশাচিক ছলনা ধারণা করিতেও শ্যামাচরণের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত। মনে হইত, পশু বলিয়া পরিচিত হইবার, এমন সুন্দর সামগ্রী আর নাই। সেই সুরা এখন তাঁহার আনন্দদায়িনী সঙ্গিনী। জীবন-যাত্রার প্রধান অবলম্বন! তিল বিচ্ছেদে, চারিদিক শূন্য বোধ হয়।

হীরা বাইয়ের সুসজ্জিত কক্ষ; পাত্রমিত্র বেষ্টিত শ্যামাচরণ। হীরা বাই পাত্রপূর্ণ সুরা, শ্যামাচরণের মুখে ঢালিয়া দিল।

শ্যামাচরণ বলিলেন, "আমি কোথায়; আবার দাও।"

হীরাবাই, আবার পাত্র পরিপূর্ণ সুরা, ঢালিয়া দিল। শ্যামাচরণ ভাবিতেছিলেন, সংসার সুন্দর; কে বলে, সংসারে সুখ নাই? এত সুখ, আর কোথায় আছে? খুঁজিয়া লও, প্রতিপদে সুখ আসিয়া,

পায়ে লুটাইবে। প্রতি নিশ্বাসে, সুখের আঘ্রাণে প্রাণ পরিতৃপ্ত হইবে। প্রতি পলকে, সুখের নববৈচিত্র্যে মন ভরিয়া যাইবে। সুখ! কে বলে সুখ নাই? সুখ যত চাও তত পাইবে। যে কেবল, আপনার কাজ করিবার জন্য, সংসারে আসিয়াছে,—যে কেবল, আপনার পুত্র পরিবার পালন করিতে শিখিয়াছে, চিরজীবন আত্মবঞ্চনা করিয়া, যে কেবল, পরের জন্য সঞ্চয় সার করিয়াছে,—সেই মনে করে, এ সংসার মরুভূমি; সুখের লেশ নাই। যে সুখ খুঁজিয়া লইতে জানে না, সে কেমন করিয়া সুখের আদর উপভোগ করিবে।

হীরাবাই বলিল, "বাবু! কি ভাবছেন?"

শ্যামাচরণ। দেখ হীরা, তুমি অতি সুন্দর। রূপের সেবা ঘৃণা করিতাম। এখন বুঝিতেছি, রূপ কি মধুর, কি মনোহর, কি সুন্দর। আমি আত্মহারা, আমি আর কিছু চাহি না, সব ভাসিয়া যাউক। মায়া, মমতা, মান, অভিমান, ধর্ম্ম, এ সকলে ছাই পড়ুক। তোমায় চাই। তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তুমি

আমায় সংসার চিনাইয়াছ, আপনার কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিয়াছ। বল চিরদিন আমার প্রাণে মিশাইয়া থাকিবে? কখনও পায়ে ঠেলিবে না? কখনও অনাদর করিবে না? শত অপরাধেও মুখ তুলিয়া চাহিবে? ইহজন্মের সকল সাধে বঞ্চিত করিবে না?

হীরা। বাবু বলেন কি, আমি আপনার বাঁদী।

শ্যামাচরণ। হীরা! তুমি জান কি,—আমি তোমার জন্য কি পর্য্যন্ত করিয়াছি। আমার সোনার সংসার, সোনার স্ত্রী, সোনার পরিজন, সব ছারেখারে দিতেছি। শিক্ষিত জীবনের মানমর্য্যাদা, তোমার পায়ে রাখিয়াছি,—সমাজের কঠোর বন্ধন ছিন্ন করিয়া, তোমায় সর্ব্বস্বসার করিয়াছি। বল, মুখের কথা বল,—দেখ আমি তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পারি কি না।

পাত্র মিত্র মহোদয়গণ, পরস্পর গা টেপাটিপি করিয়া, হাসিতে লাগিলেন। হীরাবাই বলিল, আপনি আমাকে ভালবাসেন, আমি জানি।"

শ্যামাচরণ। বড় ভালবাসি, বড় ভালবাসি, তুমি জান না, হীরা! আমি তোমায় বড় ভালবাসি। কেহ কখনও কাহাকেও এত ভালবাসিবে না, এত ভালবাসা কখনও কেহ কল্পনা করিতে পারিবে না আর কেহ কখনও এত ভালবাসিবার জন্য জন্মাইবে না।

হীরাবাই হাসিল। শ্যামাচরণ ভাবিলেন হাসি এত সুন্দর! অধরে অমৃতের ধারা উচ্ছলিয়া উঠিল; মাধুরী লহরী তুলিয়া তুলিয়া চলিয়া গেল; ফুলশরের মোহিনী ছবি সুখ স্বপ্নের মত ভাসিল।

শ্যামাচরণের মনে হইল "মরি না কেন? এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আবেশে অবশ হইয়া মরি না কেন?"

হীরা বাই গান ধরিল,—"আজু মন বসি গেয়ি সখীরি"—

একি বিঘ্ন? আমোদে বাধা পড়িল, কোথা হইতে এ আপদ আসিল? শ্যামাচরণের বাড়ীর সর-কার হরিদাস আসিয়া উপস্থিত।

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত শ্যামকান্ত লাহুড়ি চাটির জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখানে তোমাকে আসিতে কে বলিয়াছে ?"

হরিদাস সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া শ্যামাচরণের উদ্দেশে বলিল "বাবু! অপরাধ গ্রহণ করিবেন না—আপনি আমার পিতৃতুল্য। আমি আপনার নফর। এরূপ স্থানে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে বাধ্য হইয়াছি! বাড়ীতে বড় বিপদ। বৌমা মৃত্যুশয্যায়! এই চিঠি পড়ুন সমস্ত জানিতে পারিবেন।"

আপনার অবস্থা বুঝিবার জ্ঞান শ্যামাচরণের তখন ছিল না। হরিদাসের কথা কাণে গেল না। তিনি ভাবিতেছিলেন "সংসারে এত সুখ এত প্রমোদ এত আমোদ ছাড়িয়া লোকে কেবল পরের ভার বহিয়া বেড়ায়? পরের জন্য আপনার সুখ বিলাইয়া দিয়া আজন্ম কেবল পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে? অসার উপাসনা জীবনের সার করিয়া পরিণামে কি স্বচ্ছন্দ ভোগ করে কে জানে?

"বাড়ীর বিপদ" শ্যামাচরণ শুনিবার পূর্ব্বেই শ্যামকান্ত হরিদাসকে বিদায় করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। বলিলেন "হরিদাস, তুমি জান যে কাজ করিয়াছ তার কি সাজা? পিনালকোড ৪৪৮ ধারা অনুসারে তোমার যাবজ্জীবন দীপান্তর ট্রেস্‌পাসের চার্জ্জ তোমার নামে আনা হইবে।

আর একজন উকীল ছিলেন তিনি, বলিলেন "কি হে! ভোজ টেনে টেনে তোমার মাথায় আর কিছু নেই বুঝি! ট্রেস্‌পাসের চার্জ্জ আন্‌বে কি হে! স্থান অস্থান জ্ঞান নেই বরং ফোরসিবলি এন্‌টারড (Forcibly entered) এই চার্জ্জে ফেলতে পার।" ইহার মহলে একটা ভাবি হাসির ধুম পড়িয়া গেল।

হরিদাস আর থাকিতে পারিল না বলিল, "ট্রেসপাস কেন ফউজদারী আইনের যত কিছু ধারা আছে সে সমস্তই আমি মানিয়া লইতে স্বীকৃত আছি। দরওয়ান আটকাইয়াছিল, তাহাকে বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিয়াছি, পড়িয়া গোঁ গোঁ

করিতেছে সে আদালত বন্ধ করিতে পারেন। দেখুন শ্যামকান্ত বাবু, আপনাকে আমি বিশেষরূপ চিনি আপনার জ্যেষ্ঠের সহিত আমার খুব আলাপ ছিল। স্বর্গীয় মহাপুরুষ তাঁহার উদ্দেশে আমি প্রণাম করি। আপনাকে কতদিন সামলা মাথায় দিয়া রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া ট্রামগাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতে দেখিয়াছি। সে ব্যবসায় বুঝি আর কিছু হয় না? আজকাল ভদ্রসন্তানের সর্ব্বনাশ করিয়া, সংসার মজাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপনাদের মত কুলাঙ্গার সামলা মাথায় দিয়া সামলার কলঙ্ক করিয়াছে, তাই আজকাল উকীল নাম শুনিলেই আতঙ্কে কাঁপিতে হয়। কিন্তু স্থির জানিবেন অধর্ম্মের উপার্জ্জন কখনও স্থায়ী হয় না; এমন সময় আসিবে এই পাপ কর্ম্মের জন্য আপনাকে বিশেষরূপ অনুতাপ করিতে হইবে। আপনি কি মনে করেন সত্যই কলিতে ধর্ম্মের লোপ হইয়াছে, পাপ পুণ্যের বিচার করিবার দেবতা নাই। আমার পরামর্শ

ভজুন, দুষ্প্রবৃত্তি ছাড়িয়া দিন, সৎপরিশ্রমে যত হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকুন।"

শ্যামকান্ত মনে করিলেন, এমন কি কোনও উপায় নাই যাহাতে হরিদাসের মাথাটা নখে করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা যায়। অল্প হাসিয়া বলিলেন "তুমি যে নেহাৎ বাড়াবাড়ি সুরু ক'রলে হে, আর একটি কথা কইলে তোমার প্রাণের মমতা ত্যাগ করতে হবে।" হরিদাস উত্তর করিল সত্য কথা বলিয়া, ন্যায়পথে থাকিয়া, ধর্ম্মের আদর করিয়া যদি প্রাণের মমতা ত্যাগ করিতে হয়, তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই। পরকালের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছি, আমার আবার মরণের ভয় কি? কখনও কাহাকেও প্রবঞ্চনা করি নাই, কখনও কাহারও সর্ব্বনাশ করি নাই, সাধ্যমত কখনও মিথ্যা বলি নাই, পরস্ত্রী মাতৃ মত দেখিয়া আসিয়াছি, সৎপথে থাকিয়া পরিবার প্রতিপালনে মনোযোগী আছি। যদি অধর্ম্মের হস্তে মৃত্যু হয়, বুঝিব আমার অক্ষয়-স্বর্গ প্রস্তুত করিয়া ভগবান্ আমায় স্মরণ করিয়াছেন।"

শ্যামকান্ত। আমি তোমার আর কোন কথা শুনতে চাই না। তুমি বিদেয় হবে কি না বল?

হরিদাস। আপনার দেহে কি মনুষ্যত্ব নাই? আপনার কি রক্তমাংসের শরীর নহে? আপনার কি পুত্র-পরিবার নাই! স্ত্রী,—সহধর্ম্মিণী, পাপ-পুণ্যের অংশী মৃত্যুশয্যায়, একবার স্বামীকে দেখিতে চায়, নতুবা তাহার মরিয়াও সুখ নাই। আপনি এমন পিশাচ এমন নরাধম, এমন পাসণ্ড যে, পাছে এ কথা শুনিলে বাবু বাড়ী যান, তাই গোলমাল করিয়া আমাকে বিদায় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য সাধন হইতেছে না। আমি যে কাজ করিতে আসিয়াছি সে কাজে বাধা দিবে, এখন পর্য্যন্ত এমন কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। আপনার মুখ দেখিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, আপনার প্রসঙ্গে থাকিলে মহা-পাপ। আর আমি আপনার কোন কথা শুনিতে চাহি না, আপনাকে কোন কথা বলিতেও ইচ্ছা করি না।

শ্যামকান্ত। তুমি কি মনে কচ্চ আমরা দর-

ওয়ান, ছুটো ছুতোর চোটে কাৎ করে ফেলবে, আর আমরা গোঁ গোঁ করতে থাকবো! তোমার কি ক্ষমতা, আমাদের হাতছিনিয়ে বাবুকে নিয়ে যাও।

হরিদাস। ক্ষমতা আছে কি না এখনি দেখিতে পাইবেন। কলির দেবদেবীরা সব নিদ্রিত বটে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত দিনরাত হইতেছে, চন্দ্র সূর্য্য উঠিতেছে। ইহকালের সাজা খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়! তা বলিয়া মনে করিবেন না পরকালের হাত কেহ এড়াইতে পারিবে। সংযমী মহাপুরুষ ও হিন্দুর পবিত্রা কুলস্ত্রী এ যুগের জাগ্রত দেবদেবী। আপনি দেবীর বাসনা বঞ্চিত করিবেন, সে সাধ্য কুলাইয়া উঠিতে পারিবেন না। আইনের সমস্ত বই জড় করিয়া মবলগ বাহির করিলেও এক্ষেত্রে বিফল মনোরথ হইতে হইবে।

মুখের উপর চোট পাট জবাব পাইয়া, শ্যামকান্ত মনে মনে স্থির করিলেন, "আপাততঃ এ বাক্‌যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হওয়াই মঙ্গল।" প্রকাশ্যে

বলিলেন, "দেখ হরিদাস, তোমার এ অভদ্রতার শিক্ষা অতি শীঘ্র পাইবে। আমার আর কোন কথা নাই। কিন্তু তোমার বাবুর কাছে যাহা বলিতে আসিয়াছ, বলিয়া যাইতে পার।"

হরিদাস উত্তর করিল, "উত্তম, আমিও তাহা চাই, প্রথম হইতে অধীনের প্রতি এই অনুগ্রহটুকু করিলেই যথেষ্ট হইত।" শ্যামাচরণের দিকে গলা ছাড়িয়া ডাকিল, "বাবু, বাবু উঠুন, একবার উঠুন, কি বলিতে আসিয়াছি, শুনুন, আপনার অবস্থা দেখিয়া, আমার মরিতে ইচ্ছা করিতেছে।"

শ্যামাচরণ কল্পনার কেলি কাননের ভৃঙ্গ হইয়া মধুপানের মাধুরী অনুভব করিতেছিলেন, মাত্র শুনিলেন, যে একটা অপরিচিত স্বর, "বাবু" "বাবু" বলিয়া ডাকিতেছে। জড়তাপূর্ণস্বরে, কহিলেন, "কে তুমি? কোন সাগর থেকে ঝাঁপিয়ে এলে চাঁদ?"

হরিদাস বলিল, "আজ্ঞে আমি হরিদাস। কি বলিতে আসিয়াছি শুনুন।"

শ্যামাচরণ। তুমি—তুমি হরিদাস! তুমিই কি

আমায় কল্পনার রাজ্য হইতে টানিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছ? আমার প্রাণভরা প্রেমে কালি ঢালিতে আসিয়াছ। ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র সুখটুকুতে আগুন জ্বালিতে আসিয়াছ? আমার বুকের ধন ছিনাইয়া লইতে আসিয়াছ? হরিদাস, তুমি আমার সর্ব্বস্বের অধিকারী হও। তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই। তোমার হাতে ধরিয়া বলিতেছি, আমার কাছে আসিও না, আমার মুখ আর দেখিও না, আমার কোন কথাও আর রাখিও না। সংসার, গুরুভার—আর বহিতে পারি না। সংসার ছার, জাতি ছার। আর ভুলিয়া থাকিব না। সুপথ পাইয়াছি, উচ্চ স্থান ধরিয়াছি, মজিয়াছি, সাধ করিয়া ভাসিয়াছি। তুমি কে? তুমি কেন আমার কাছে আসিয়াছ? তোমার সহিত কি সম্বন্ধ?

হরিদাস। ছি ছি বাবু আপনাকে কি বলিব, বলিবার কিছু নাই। আমার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে। আপনার উপর কত আশা ছিল,—আপনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র,—

কোথায় সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিবেন, দেশের উপকার করিবেন, দরিদ্রের দুঃখমোচন করিবেন আপনার পরিণাম এই? বেশ্যাসক্ত, মাতাল বলিয়া সাধারণে পরিচিত হইতেছেন? আপনার মনুষ্যত্ব হারাইয়া, পিতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছেন? শিক্ষিত জীবন লইয়া আপনারা যদি চরিত্র নষ্ট করিবেন আমরা মূর্খ, ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান নাই, আমরা তবে কি করিব?

শ্যামাচরণ। বিষ খাইয়া মরিবে আর কি করিবে? হরিদাস তুমি মনে করিয়াছ, আমি আমার মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশু হইয়া পড়িয়াছি,—আপনার কর্ত্তব্য জ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া, পিতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছি। আমায় বুঝাইয়া দাও, কি পাপে আমি সমাজের ঘৃণ্য হইয়াছি? দেখ! পৃথিবীতে লোক দুদিনের জন্য, এই আছে এই নাই, কাহার মুখ চাহিয়া পড়িয়া থাকিব? কাহার সুখের জন্য অর্থ উপার্জ্জন করিব! কাহার পরকালের জন্য আপনার স্বচ্ছন্দে পদাঘাত করিব।

প্রাণের পুত্র, যাহার জন্য লোকের অপ্রিয় হইয়া, পরের বোঝা বহিয়া, মান অভিমান জলাঞ্জলি দিয়া দাসানুদাস হইয়া, অর্থ সঞ্চয় করিলাম; সেই প্রাণাধিক পুত্র আমার বুকে ছুরি মারিল। পাছে আমার বহুশ্রমের অর্জ্জিত ধন আমি দুই দিন ভোগ করি। পতিপরায়ণা স্ত্রী! যাহার তুষ্টির জন্য, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিলাম, আপনার সাধে ছাই পাড়িয়া, যাহার সাধ পুরাইবার জন্য ব্যগ্র হইলাম, যাহার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য পরের লাঞ্ছনা গঞ্জনা পরম আদরের বলিয়া বুক পাতিয়া লইলাম, সেই পতিপ্রাণা সময়ে অবিশ্বাসিনী হইল। পুত্র-পরিবার লইয়া সংসার; পুত্র-পরিবারের এই ত মহিমা! অসার প্রশংসাবাদ, সাধারণ লোকধর্ম্ম, স্বার্থপূর্ণ সমাজ আমার থাক। আমি যে পথের আশ্রয় লইয়াছি; সেই পথই সার করিব। তোমরা কাজের লোক, পৃথিবীতে কাজ করিতে আসিয়াছ, কাজ করিয়া যাও; সংসারধর্ম্ম পালন করিতে শিখিয়াছ, তাহাতে মনোযোগী হইও না।

স্ত্রী, পুত্রের, ভবিষ্যৎ, ভাবিয়া, পরের মুখাপেক্ষী হইয়া আছ, যতদিন বাঁচিবে সেই ভাবেই থাক। নূতন শিক্ষায় আমার বড় কিছু প্রয়োজন নাই। আমি যেমন আছি তেমনি থাকিতে চাই। সংসারের কোথায় কি হইতেছে, জানিবার কোনও ইচ্ছা রাখি না।

হরিদাস : আপনি অন্নদাতা পিতা, আপনার কথার উপর কথা বলিব সে সাধ্য নাই। যথেষ্ট বাচালতা করিয়াছি, অপরাধ মার্জনা করিবেন। আপনার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, আমার এই অনুরোধটি রাখুন, একবার বাড়ী চলুন। বলিব কি, বলিতে বুক ফাটিয়া যায়; বৌমা মৃত্যুশয্যায়, মা ঠাকরুণও আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন; কে কার মুখে জল দেয় তাহার ঠিক নাই। এই চিঠি পড়ুন যেরূপ বিবেচনা হয় করুন। অতি কাতরস্বরে শ্যামাচরণ বলিলেন, "না না হরিদাস, তুমি কি আমার সহিত ছল করিতেছ? পৃথিবীর যত কিছু অমঙ্গল সংবাদ, আমি সব শুনিতে প্রস্তুত

আছি। কিন্তু যে কথা বলিলে, ওকথা আর বলিও না। আমায় বাড়ী যাইতে বল এখনি যাইতেছি। আত্মহত্যা করিতে বল, তাহাতেও অসম্মতি নাই; সর্ব্বস্বে বঞ্চিত হইয়া পথের ভিখারী হইতে বল, তাহাতে আমার কোন বাধা নাই। আদর যত্ন সম্মান—একথা আমায় আর শুনাইও না। হরিদাস আমার প্রাণের ব্যাকুলতা বুঝিতে পারিতেছ কি দাও দাও কি চিঠি দেখি।"

পত্রবাহক হরিদাস, শ্যামাচরণের হস্তে পত্র দিল। হীরাবাই এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। আর থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি চিঠি খানা কাড়িয়া লইল। শ্যামাচরণ হীরার মুখপানে চাহিলেন, "হীরা! তোমার এ কেমন আচরণ?"

হীরা বলিল "বাবু এ চিঠি আমি আপনাকে দিব না।" "ওকি বাবু, আপনি আমার মুখের পানে অমন ক'রে চেয়ে আছেন কেন?

শ্যামাচরণ। তোমার অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিতেছি; তোমার মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া আত্মহারা

হও

হইতাম, রঞ্জিত অধরে মধুর হাসির চঞ্চল লহরী
দেখিয়া মাতোয়ারা হইতাম, মুখের কথা শুনতে
শুনিতে বিভোর হইয়া, আত্মপর ভুলিতাম; তোমার
বুকে ধরিয়া স্বর্গসুখ তুচ্ছ করিতাম; তোমার একি
রূপান্তর! মুখের পানে চাহিতে ভয় হয়, তোমার
রূপে আগুন জ্বলিতেছে, হাসিতে বিষ ঝরিতেছে,
নয়ন কোণে ছলনার তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতেছে।
আর ভুলিব না, পাপ পঙ্কে আর ডুবিয়া থাকিব
না। প্রাণের সুধার আর হারাইব না। পিশাচী
সর্ব্বনাশী, আমার জীবনের সুখ শান্তি হরিয়া লইতেছে।
আমায় পশুর অধম করিয়া পথের ভিখারী করিবার
পন্থা করিয়াছে। চল হরিদাস, আজ আমার বড়
শুভদিন। আজ আমার বড় শুভদিন। হরি
দাস বলিল, "বাবু! ও মাগী চিঠি ফিরাইয়া না দেয়
তাহাতে বড় বিশেষ ক্ষতি নাই। পত্রের ভাবার্থ
আমি আপনাকে বলিতেছি, সুন্দরী ঠাকরুণ লিখিয়া-
ছেন, বৌমা মৃত্যুশয্যায় কাল রাত্রে হঠাৎ বুকে
একটা বেদনা ধরিয়া ক্রমে এত বাড়িয়াছে, যে নিশ্বাস

ফেলিতে পারিতেছে না। ডাক্তার আনান হইয়াছিল তিনি "আশা নাই" বলিয়া গিয়াছেন। অতএব আমোদ স্থগিত করিয়া আপনাকে একবার বাড়ী যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন।

শ্যামাচরণ আর কোন কথা কহিলেন না, কাহারও উত্তরের অপেক্ষা করিলেন না, কাহারও প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন না, উঠিলেন; হরিদাসও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। হীরাবাই চোখ টিপিয়া কি ইসারা করিল। শ্যামাচরণের হাত ধরিয়া টানিয়া শ্যামকান্ত বলিলেন "কি হে ইয়ার আমাদের ফেলে কোথায় যাও। বোতল ফাঁক আর এক বোতলের আমদার কর। এমন বেতালা মানুষ হ'লে চ'লবে কেন বাবা!

শ্যামাচরণ উত্তর করিলেন "শ্যামকান্ত বাবু! তুমি না আমার বন্ধু। তুমি না আমার ব্যথায় ব্যথিত। তুমি না আমার সুখ দুঃখের সাথী। তোমার একি চাতুরী। আমার সর্ব্বনাশ করিয়া

তোমার কি স্বার্থ সাধন হইবে। আমায় পথের ভিখারী করিয়া পশুর অধম করিয়া, সমাজের হেয় করিয়া তোমার কি উপকার হইবে। ইহকাল, পরকাল, বড় সাধের সংসার, বড় আদরের আসর, এ সকল ছারেখারে দিয়া তোমার কি উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল। তোমায় বন্ধু বলিয়া ডাকিয়াছি; সহোদরের অধিক ভালবাসিয়াছি; তোমায় আর কি বলিব পাপপুণ্যের দণ্ডদাতা যদি কেহ থাকেন, তিনি ইহার বিচার করিবেন।"

আর কোন কথা নাই। হাত ছিনাইয়া শ্যামাচরণ একেবারে রাস্তায়। পশ্চাতে হরিদাস, মুহূর্ত্তে কি একটা অভাবনীয় ঘটনা হইয়া গেল। হীরা স্তম্ভিত! শ্যামকান্ত স্তম্ভিত! ইয়ারবর্গ স্তম্ভিত!

৮

আদরের দিন ফুরাইয়াছে। তাহার দুদিনের হাসি, দুদিনের খেলা, দুদিনের সুখ বুঝি দুইদিনে ফুরাইল। তাহার আদরের সাধ, আদরের আশা, আদরের পিপাসা এ জন্মে আর মিটিল না। মর্মান্তিক বেদনা, প্রাণভরা হাহাকার, শান্তিহীন জীবন লইয়া কে জানে সে আজ কোথায় চলিয়াছে; হায় রে যদি পাপ-পুণ্য লইয়া, সুখ দুঃখ ধর্ম্ম অধর্ম্ম লইয়া জগত, ভাল মন্দ লইয়া সংসার, তবে বলিতে পারি না বালিকার ক্ষুদ্রজীবনে কি জটিল কর্ম্ম ফের জড়িত ছিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে। জ্যোৎস্নার হার গলায় পরিয়া প্রকৃতি হাসিতেছে, সুষুপ্তি প্রকৃতির অঙ্কে অঙ্কে মিশিতেছে। প্রকৃতি আমোদিনী।

মলিন জ্যোৎস্নার মত আদর পড়িয়া আছে; সুন্দরী তাহার বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতেছে।

আদরের বুকের ব্যথা এত বাড়িয়াছে যে, শ্বাস ফেলিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল ডাক্তার আসিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই।

আদর অতি কষ্টে কথা কহিল বলিল "সুন্দরী, ভাই! আমি চলিলাম। আর কথা কহিতে পারিতেছি না, আমার মনে হইতেছে এইবার বুক ফাটিয়া মরিব। এ জন্মের মত এ সংসার ছাড়িয়া চলিলাম। আর কাহাকেও প্রাণের জ্বালা জানাইতে আসিব না, আর কাহারও বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিব না, মনের আগুন জ্বালিয়া আর কাহাকেও পোড়াইব না। কোথায় যাইব কে জানে! হয়ত সেথা পরম আদর পাইব, কাহারও মুখ চাহিতে হইবে না, কাহারও পদে সহানুভূতি ভিক্ষা করিতে হইবে না, কাহারও করুণার উপর আত্মজীবন নির্ভর করিতে হইবে না। চোখের এক ফোঁটা জল দেখিলে শত সহস্র স্নেহময়ী জননী ছুটিয়া আসিয়া আঁচলে চোখ মুছাইয়া দিবে। প্রাণের

৮০

আদর্শ

একটু ব্যথা প্রকাশ পাইলে যে বেথা আছে, কোন পাতিয়া দিয়া আমার বেদনা আপনার বুকে তুলিয়া লইবে। অন্তরে হাহাকারের অভাব উঠিলে, অমৃতের ধারা ঢালিয়া দিয়া পরিতৃপ্ত করিবে। সেথা ব্যথিতের বেদনা নাই, বিরহীর অশ্রুজল নাই, মর্ম্মপীড়িতের কাতরতা নাই,—প্রাণভরা আলো, প্রাণভরা শান্তি, প্রাণভরা অনুরাগে সে রাজ্য পরিপূর্ণ। ভাই! আমি চলিলাম, মরিবার সময় প্রাণের বোঝা লইয়া যাইতে পারিব না, তোমার কাছে নামাইয়া যাই। দেখ, মরণে আমার খেদ নাই। বড় দুঃখ কি জান, আমার স্বামীর দেবচরিত্র কলঙ্কিত দেখিলাম, পবিত্রতার স্বর্গে নরকের অন্ধকার দেখিলাম, দেবভূমে পিশাচের নৃত্য দেখিলাম, সে যন্ত্রণাও ভুলিতে পারিতাম যদি এ সময়ে একবার"—আদর আর বলিতে পারিল না, বুক বহিয়া অন্তরের অজস্র জালা গড়াইয়া পড়িল! সুন্দরীর মর্ম্মে মর্ম্মে বাজিল! সুন্দরী কাঁদিল।

হায়রে! এ সংসারে কোথায় কে কাঁদিতেছে, দুঃখের কঠোর আলিঙ্গনে পীড়িত হইয়া, কোথায় কে মাথা খুঁড়িতেছে, মর্মোচ্ছ্বাসে ছাই পড়িয়া সংসারে সম্বন্ধহীন হইয়া, কোথায় কে অনাথ হইয়া বসিয়া আছে,—দেখিয়া শুনিয়া খুঁজিয়া পাতিয়া যদি তাহাদের বিদীর্ণ-হৃদয়ে একবিন্দু সহানুভূতি মিশাইতে পারিতাম, ব্যথিত প্রাণের একটা দীর্ঘশ্বাস যদি বুক পাতিয়া লইতাম, সংসার সম্বন্ধহীন অনাথ-দিগের পদপ্রান্তে লুটাইয়া, যদি তাহাদের সাথী হইতে পারিতাম,—কে জানে সে জীবন কেমন? সুখের—কি—দুঃখের!

চোখ মুছিয়া সুন্দরী বলিল "আদর! যদি কাঁদিবার সুখ বুঝিয়া থাক, কাঁদ; আর ত সময় পাইবে না। কে বলে দুঃখে কান্না আসে? কান্না অপেক্ষা সুখ নাই। যে কাঁদিতে শিখিয়াছে সে আর হাসিতে চাহিবে না। কাঁদ আদর, প্রাণ ভরিয়া কাঁদ। আমিও কাঁদি। বুকের বেদনা নামিয়া যাক্, মনের মালিন্য দূর হ'ক, শান্তির মধুর

কল্লোল শ্রুতিস্পর্শ করুক। পৃথিবীর জঞ্জাল এড়াইয়া, সংসারের স্বার্থজড়িত আনন্দ ছাড়িয়া, সেই চিরানন্দধামে যাইতেছ। হেথায় তোমার আদর কেহ বুঝিল না, তোমার স্বর্গীয় প্রেমে কেহ মজিল না, তোমার প্রাণভরা যত্নের কেহ বিনিময় দিল না। প্রার্থনা করি, যাঁহার পদে আশ্রয় লইতে যাইতেছ, তাঁহার আদরের ধন হও, তাঁহার অসীম—অনন্ত—অবিচল করুণার অঙ্কে সমর্পণ করিয়া, সুখ দুঃখের পার্থক্য ভুলিয়া যাও। সেই প্রেমময় পরমাত্মা পরম পুরুষের পদে লুটাইয়া স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা কর। হয়ত' আবার দেখা হইলে হইতে পারে।"

আদরের চক্ষে জল,—অবিচল-নেত্রে সুন্দরীর মুখপানে চাহিয়া আছে; স্বর ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। আদর বলিল, "কে জানে ভাই! আমার প্রাণ কেমন করিতেছে। চোখের উপর দিয়া, যেন কত আলো ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। কাহারা যেন মুগ্ধকরী বীণার ঝঙ্কার শুনাইয়া, যুগ যুগান্তরের

মধুর স্মৃতি আনিয়া দিতেছে; আশে, পাশে, কাহারা যেন বসিয়া আছে! আমায় কোলে করিতে চায়, বুকে রাখিতে চায়,—অভিমান, আত্মীয়তা, মমতা, সন্তাপ ফেলিয়া দিতে বলিয়া, যেন আমায় টানিয়া লইয়া যাইতে চায়। আহা! উহারা যেন আমার কত আপনার।"

সুন্দরী বুঝিল,—ও সকল প্রলাপ মাত্র,—মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ।

আদর আবার বলিল, "সুন্দরী! ভাই! জন্ম লইয়া আসিলাম, জীবনের কর্ম্ম কি হইল? সংসার চিনিতে না চিনিতে অনাথা হইলাম। বাপ, মা দুই হারালাম! আত্মীয় স্বজন যাহারা আছে, তাহারা আপনার লইয়াই ব্যস্ত, আমার খোঁজ খবর লইবার সময় কই? শ্বশুর শাশুড়ীর স্নেহে, সে দুঃখ ভুলিয়াছিলাম,—প্রেমময় স্বামীসম্মিলনে সংসারের উপর নূতন দৃষ্টি পাইয়াছিলাম,—পতি-সেবা করিয়া, পতিপ্রেমে মজিয়া, সুখী হইয়া-ছিলাম। তত সুখ, বুঝি কেহ কখনও উপভোগ

করে নাই। অভাগীর অদৃষ্টে আগুন জ্বলিল, সুখ, সম্পদ, প্রেম, পিপাসা, সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, সাগর তরঙ্গে তৃণ হইয়া ভাসিলাম। একে একে সব যায়। সুন্দরী! ভাই! আমার বুকটায় হাত দাও। আমার বুক যেন কে চাপিয়া ধরিতেছে! সর্বাঙ্গ দিয়া আগুন ছুটিতেছে। আমার প্রাণ যায়।”

সুন্দরী আদরের গায়ে হাত দিয়া দেখিল,—বড় উত্তাপ। প্রতি লোমকূপ দিয়া, যেন অগ্নি-কণা বাহির হইতেছে। জ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িয়াছে বুঝিল, ডাকিল, “আদর!” সাড়া নাই। আদর অচেতনা।

সুন্দরী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল,—তখনই মনে হইল, বিপদে অধৈর্য্য হইলে, বিপদ বাড়ে বই কমে না। কাঁদিবার সময় অনেক পাইব, এখন ধৈর্য্য হারাইলে সব হারাইব। এমন সময়, ইংরেজ ডাক্তার, সঙ্গে আর একজন বাঙ্গালী ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুন্দরী

রোগীকে সামলাইয়া দিয়া আপনিও সামলাইয়া বসিল। ইংরেজ ডাক্তার রোগীর পরীক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। ইত্যবসরে বাঙ্গালী বাবুটী, সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রোগীকে রীতিমত ঔষধাদি খাওয়ান হইতেছে

সুন্দরী উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ।" বাঙ্গালী বাবুটী আবার বলিলেন, দেখ! তোমাকে বার বার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, রোগীর ঘরে তুমি ছাড়া আর একটী প্রাণীও যেন প্রবেশ করিতে না পায়: তাহাতে রোগীর মন্দ হইবার সম্ভাবনা।"

সুন্দরী। আপনার উপদেশ মত সকল কাজ করিতেছি,—বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। ডাক্তার বাবু! আমার একটী অনুরোধ আছে। আপনার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, এই অনুরোধটী রাখিতে হইবে। রোগীর শাশুড়ী, পাগলিনীর মত হইয়া, অন্য ঘরে পড়িয়া আছেন, কয়দিন মুখে একটু জল পর্য্যন্ত দেন নাই। তিনি

দিনান্তে রোগীকে একটীবার মাত্র দেখিতে চান। আহা! ডাক্তার বাবু, বলিব কি, সে বুড়ির অবস্থা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। আপনি অনুমতি করুন, তিনি দিনান্তে একবার আসিয়া রোগীকে দেখিয়া যাইবেন।"

বাঙ্গালী বাবুটীর চোখে জল আসিল—তিনি বলিলেন,—"দেখ! আমিও বাঙ্গালী তাঁহার মনের অবস্থা আমি বুঝিতে পারিতেছি। দেবতার অধিক স্বামী, ইহলীলা সম্বরণ করিলেন; বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে,—শিক্ষিত উপযুক্ত সন্তান, মদ্যপায়ী বেশ্যাসক্ত হইয়া, পিতৃপুরুষগণের নাম ডুবাইল। বিপদের উপর বিপদ! বজ্রাঘাত-তরু, একটীমাত্র পল্লব লইয়া, প্রান্তর সজ্জিত রাখিয়াছিল, তাও বুঝি পুড়িয়া যায়! যাহা হউক, আপাততঃ ও সকল কথার আন্দোলন বৃথা। রোগীর শাশুড়ী দিনান্তে একবার আসিতে চান, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি নাই; তবে কথাটা কি জান,—রোগীর ঘরে বেশী লোকের নিশ্বাস প্রশ্বাস

পড়িলে, রোগীর আরও মন্দ হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ তিনি এরূপ অবস্থা দেখিলে, হয় ত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিবেন, তাহাতে সম্পূর্ণ অপকার হইবে। তাঁহাকে বুঝাইয়া একটু ধৈর্য্য ধরিতে বলিও; যদি ভগবান্ দিন দেন, তাঁহার ধন তিনি চিরদিন দেখিবেন।

পরীক্ষা শেষ করিয়া, ইংরেজ ডাক্তার, রোগীর অচেতন অবস্থা হইবার কারণ জানিতে চাহিলেন।

সুন্দরী বলিল, "বেশ কথা কহিতেছিল, হঠাৎ এইরূপ অবস্থা হইয়াছে।" বাঙ্গালী বাবুটী, ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া, ভাবার্থ ইংরেজ ডাক্তারকে বুঝাইয়া দিলেন।

অনেক কথাবার্ত্তার পর, যথাবিহিত ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া ইংরেজ ডাক্তার বাঙ্গালী বাবুটীকে বলিলেন, রোগীর অবস্থা বড় শোচনীয় দেখিতেছি! যাহা হউক, আপাততঃ আমরা বিদায় লইতে পারি। দেখ, বাঙ্গালীর নীতি, চরিত্র, আমি কিছুই বুঝিতে

পারি না। স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়, স্বামী বন্ধুবর্গের সহিত বেশ্যালয়ে আমোদ উপভোগ করিতেছে। তোমাদের বাঙ্গালীর এই জন্যই দিনদিন একরূপ অধোগতি হইতেছে।" এই বলিয়া বিদায় লইলেন।

হায়! বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ আপনার স্ত্রীকে ভালবাসিতে জানে, যত্ন করিতে জানে, তবু তাহারা পত্নী-প্রেমে অনেক সময় বঞ্চিত, কিন্তু আমরা স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলিয়া জানি,—সম্মুখে নারায়ণ সাক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া তাহার ভার লইলাম—তারপর তাহাকে দুই পায়ে দলিতে লাগিলাম। বাঙ্গালীর পত্নী, পতিত্যাগ করিয়া অন্যের পাণিগ্রহণ করিয়াছে, দেখিয়াছ কি?

বাঙ্গালী বাবুটী যাইবার সময় সুন্দরীকে বলিয়া গেলেন, "দেখ! খুব সাবধান হইয়া রোগীকে ঔষধপত্র খাওয়াইও। বাঙ্গালীর ঘরে তোমার মত বুদ্ধিমতী, ধৈর্য্যশালিনী স্ত্রীলোক আমি আর কখনও দেখি নাই। তোমাকে বলিয়া যাই রোগীর অবস্থা যতদূর সম্ভব মন্দ হইয়াছে। বুকের রক্ত

মানত করিয়া পরমেশ্বরের নিকট তোমার প্রিয় ভগিনীর আরোগ্য প্রার্থনা কর। চিকিৎসা শাস্ত্রে আর কোনও ব্যবস্থা নাই।"

নির্জ্জন গৃহ। দীপশিখা মাত্র জ্বলিতেছে, ক্ষীণালোক কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছে। নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আবার জ্বলিতেছে। যেন কালবক্ষে পাপ-পুণ্যের অদ্ভুত ক্রীড়া হইতেছে।

দীপশিখার ন্যায় আনন্দের শুষ্ক জীবনের ক্ষীণালোক জ্বলিতেছে! দীপশিখার ন্যায় সুন্দরীর শুষ্ক আশার ক্ষীণালোক জ্বলিতেছে। সুন্দরী—কাঁদিতেছে! নীরব ক্রন্দন, অস্ফুট ক্রন্দন, মর্ম্মভেদী করুণ-ক্রন্দন। মুখের একটুও রূপান্তর নাই, ধৈর্য্যের একটুও বিচলতা নাই, গাম্ভীর্য্যের একটুও ব্যতিক্রম নাই—কেবল দুটী চোখে দুফোঁটা জল,—যেন দুটী ব্যথিত ব্রহ্মাণ্ড দুলিতেছে।

ডাক্তার বলিয়া গিয়াছে, চিকিৎসা শাস্ত্রে আর কোনও ব্যবস্থা নাই তখন আর উপায় কি! প্রাণপণে মুক্তকরে পরমেশ্বরকে ডাকিয়া বলিতেছিল,

"প্রভু! আমার সমস্ত পরমায়ু লইয়া আদরের জীবন দান কর! যেন সে, তাহার স্বামীর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক হইয়াছে, দেখিয়া মরিতে পায়। দয়াময়! অধিনীর আকিঞ্চন পূর্ণ কর।"

গৃহদ্বারে পদ শব্দ, সুন্দরী চমকিয়া উঠিল দেখিল, অনুতাপিতের জীবন্ত-মূর্ত্তি শ্যামাচরণ, পশ্চাতে হরিদাস।

কোনও কথা না কহিয়া, শ্যামাচরণের দিকে চাহিতে চাহিতে সুন্দরী ঘরের বাহির হইয়া গেল; শ্যামাচরণ বুঝিলেন সুন্দরীর দৃষ্টি তাঁহাকে বলিয়া গেল, 'তোমারই অযত্নে সুবর্ণ পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পাখী উড়িয়াছে; যখন উচ্চ গগনে উঠিয়া, কাকলী বিলাইতেছে, তখন আসিয়া, তাহাকে সুখের ডাক ডাকিতেছ! আর কেন সে আসিবে? স্বর্গের পাখী স্বর্গ অভিমুখে চলিয়াছে; মর্ত্তের নির্ম্মমতায় আর কেন সে মজিবে!'

শ্যামাচরণের মনে হইল, 'এ সংসার একটা ছায়া মাত্র। সুখ দুঃখ, প্রেম প্রীতি সব ছায়ার

সজ্জিত! ছায়াদেহী মানবসকল, কেবল ছায়ার সুখ, ছায়ার দুঃখ লইয়া ঘুরিতেছে, ছায়ার দেহডোর আর কেন? পতনেই মঙ্গল। জীবন পটে কখনও কোনও সুখচিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল কি না, মনে হয় না,—কিন্তু যে চিত্র সম্মুখে দেখিতেছি জন্ম জন্মান্তরেও এ স্মৃতি মিলাইবে না।” শ্যামাচরণ কাঁদিতে লাগিলেন। হরিদাস বলিল, “বাবু, ডাক্তার আসিবার কথা ছিল, আমরা উপস্থিত ছিলাম না; ডাক্তার আসিয়াছিল কি না, আমি জানিয়া আসিতেছি।” বলিয়া প্রস্থান করিল।

শ্যামাচরণ আদরের পাশে গিয়া বসিলেন। আদরের চেতনা নাই,—যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠাহীন স্বর্ণ প্রতিমা পড়িয়া আছে। নিমীলিত নেত্র দুটী মধ্যে মধ্যে কাঁপিতেছে, যেন নিরাশার অন্তে আশার ক্ষীণভাতি চমকিয়া আবার মিলাইতেছে। মলিন অধরে ঈষৎ হাসি ফুলের সৌরভের মত ফুটিয়া উঠিতেছিল, যেন অন্তরের প্রতিভা অন্তরে জাগিয়া অনন্তের উদ্দেশে ভাসিয়া যাইতেছিল।

অবসান

শ্যামাচরণ ডাকিলেন "আদর!" সাড়া নাই; একটী দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল মাত্র। শ্যামাচরণের সর্ব্বাঙ্গ যেন ঝলসিয়া গেল। আবার ডাকিলেন "আদর!" আদর চোখ চাহিল; বসন্তের প্রথম চুম্বনে ফুলকলি যেন আঁখি মেলিল, স্বর্ণপিঞ্জরে প্রাণপাখি আবার ফিরিয়া আসিল, প্রলয়ের অন্ধকারে সৃষ্টির প্রথম অঙ্কুর বিকাশ পাইল। কিন্তু সে কতক্ষণ? জলবিম্ব উঠিল মাত্র। আদর কথা কহিল, বহুদিনের বেসুরা বীণা বাজিল, "প্রভু, পতি, প্রাণেশ্বর, তুমি আসিয়াছ? আর আমার মনের দুঃখ কি? আমার সকল খেদ মিটিল। দেবপদে যথার্থ বিল্বদল দিয়াছিলাম, তাই এ সময়ে তোমার দেখা পাইলাম আর কথা কহিতে পারিতেছি না, অনেক কথা বলিবার ছিল, প্রভু! মনের তরঙ্গ মনেই রহিয়া গেল। যদি আর কোথাও দেখা হয়, সে আশা দুরাশা,— তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া একে একটী করিয়া সকল কথা বলিব। মিনিস্ত্তার স্মৃতির মালা

গাঁথিয়া তোমার গলায় পরাইব।" আদর নীরব হইল, দৃষ্টি শূন্য পথে স্থাপিত, মৃণাল বাহু দুটী শ্যামাচরণের পায়ের উপর পড়িল; আদর কাঁদিতেছে, হাসিতেছে। আবার বেসুরা বীণা আরোও বেসুরা হইয়া বাজিল উঠিল, "প্রভু! প্রভু! আবার আমার কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে, এ আমি কোথায় আসিলাম? পরিচিত কাহাকেও দেখিতেছি না, তুমিও ত দেখা নাই।—তোমরা কারা? তোমাদের দেবমূর্ত্তি দেখিয়া আপনার পর সব ভুলিয়া যাইতে হয়। প্রভু! পরম ঈশ্বর! আমায় লইয়া যাইতেছে, আমি চলিলাম। দেখ! আমায় চাঁদের আলো মাখাইতেছে, নক্ষত্রের হার গলায় দিতেছে। একি ফুল? এমন সৌরভ জীবনে কখনও আঘ্রাণ করি নাই, আমার শেষ, ধর্ম্মের শেষ, কর্ম্মের শেষ।" বীণা নীরব হইল, এ জন্মের মত নীরব হইল। আবার কখনও বাজিবে কি না, কে জানে?

শ্যামাচরণ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সুন্দরী ছুটিয়া আসিয়া আদরের শয্যার উপর পড়িয়া

কাঁদিতে লাগিল ; তেমন কান্না বুঝি সে কখনও কাঁদে নাই।

রাজেশ্বরী পাগলিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ-দ্বারে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, আর উঠিলেন না। হরিদাস আসিয়া শ্যামাচরণকে বাহিরে লইয়া গেল। তখন পূর্ব্বাকাশ ভেদ করিয়া উষার রক্তিমাভা ধীরে ধীরে দিক্‌প্রকাশ পাইতেছে।

তৎপর আদরের ইহলীলা ফুরাইল, আমাদের [illegible] শেষ হইল।—শ্যামাচরণের কি হইল? এই স্থানে সে কথা—সে মর্ম্মভেদী কাহিনী আর শুনিয়া কাজ নাই।